শ্রীবিশ্বেশ্বর মিত্র

পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-২৯

পৃথিবীব্যাপী মানব সভ্যতার উত্থান-পতন, ভুল-ভ্রান্তির ভিতর দিয়ে সর্বকালে মানুষের উন্নতি করবার একান্ত চেষ্টা এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। সংক্ষেপে এ গল্প বলা দুরূহ কেন, প্রায় অসম্ভব। এই বইটিতে তাই পৃথিবীর ইতিহাসের মূল ঘটনাগুলি বেছে নিয়ে সংক্ষেপে তার আলোচনার চেষ্টা করেছি। কাযের চাপে যাঁরা ইতিহাসের সঙ্গে বিশেষ যোগ রাখতে পারেন নি হয় তো এই বইখানির পাতা উল্টে যেতে তাঁদের মন্দ লাগবে না।

এ পুস্তকের স্বল্প পরিধির ভিতর অনেক বিষয়েই বিশেষ বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব হয় নি ; তবু যেখানেই প্রয়োজন মনে হয়েছে সেখানেই ঘটনা বিশেষের গুরুত্বের দিকে ইঙ্গিত করেছি।

এ পুস্তক রচনায় আমার বন্ধু শ্রীমনোজকুমার নিয়োগী ও শ্রীকান্তি প্রসাদ চৌধুরীর নিকট থেকে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করেছি। আমি তাঁদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। শ্রীমতী পদ্মরেণু মিত্রও আমাকে নানা ভাবে উৎসাহ দিয়েছেন। শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড বইটি প্রকাশের জন্য যে আগ্রহ দেখিয়েছেন তার জন্য আমি তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। শ্রীমান্ রমেন্দ্র কুণ্ড ছবিগুলি এঁকে বইটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করতে ত্রুটি করেন নি, এজন্য তিনিও আমার ধন্যবাদের পাত্র।

১৫ই মে, ১৯৫০ — বিশ্বেশ্বর মিত্র

কলিকাতা

পরিচ্ছেদ সূচী

এই পৃথিবী

কতদিনের প্রাচীন আমাদের এই পৃথিবী, কবে কী করে এর জন্ম হল, আমাদের পূর্বপুরুষেরা কেমন করে এখানে এলেন, কী অবস্থার মধ্য দিয়ে যুগে যুগে আমরা উন্নতি করে চলেছি—এমন কত সব প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। কিন্তু যে গ্রহে আমরা জন্মেছি তার উৎপত্তির বিষয় আমরা জানিনা বললেই হয়; আর মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধেই বা আমরা কতটুকু জানি?

যে সকল মনীষী পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে অতি সুদূর অতীতের কোন এক সময় কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুণ সূর্য্যের এক নগণ্য অংশ তার দেহ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু সূর্যের আকর্ষণের ফলে এই বিচ্ছিন্ন অংশ শেষ পর্যন্ত এক নির্দিষ্ট পথে সূর্যপ্রদক্ষিণ আরম্ভ করে। এই বিচ্ছিন্ন অংশই নাকি আদি পৃথিবী।

প্রথম অবস্থায় পৃথিবী ছিল অতি উষ্ণ নরম পদার্থ ও গ্যাসের সমষ্টি বিশেষ। কালক্রমে নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে অবিরত ঘূর্ণনের ফলে পৃথিবী ঠাণ্ডা এবং শক্ত হয়ে ওঠে।

পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে এগুতে থাকলে আমাদের চোখে ঠেকবে মংগলগ্রহ ; আরও বহুদূরে বৃহস্পতি, তারপর শনিগ্রহ ; আরও অনেক দূরে ইউরেনাস এবং নেপচুন।

একটি গ্রহ থেকে আর একটি গ্রহের দূরত্ব কী বিরাট্ তা কল্পনা করাও অতি কঠিন! পৃথিবী থেকে নেপচুনের দূরত্ব হচ্ছে ১০,৭৯৩ লক্ষ মাইল। সৌর জগতের এই লীলাখেলা চলেছে অসীম মহাশূন্যের এক পাশে। নিঃসীম শূন্যের মাঝে ভাসছে অতি সূক্ষ্ম কুয়াসার কণা।

ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয় কী বিরাট শূন্যের মাঝখানে এই ছোট্ট পৃথিবীতে চলেছে জীবন নাটকের খেলা। প্রাণের অস্তিত্ব অন্য কোন গ্রহে ছিল কিম্বা আছে কি না আমরা জানি না। পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহে প্রাণী থাকা সম্ভব কিনা তাও আমরা সঠিক বলতে পারি না। মাটি ভেদ করে তিন মাইল নীচে কোন প্রাণী জীবিত অবস্থায় যেতে পারে বলে আমরা শুনি নি ; ভূপৃষ্ঠের পাঁচ মাইল উপরেও প্রাণের অস্তিত্ব আমরা পাই না। সমুদ্রগর্ভে খোঁড়াখুঁড়ি করে মানুষ পাঁচ মাইলের নীচে জীবনের সন্ধান পায় নি। পৃথিবী থেকে সাত মাইল উপরে খোঁজ নেওয়া সম্ভব হয়েছে। তার ফলে

জানতে পারা গেছে ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঁচ মাইলের বেশী উঁচুতে জীবিত অবস্থায় কোন জীব উঠতে পারে না।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞান আমরা এ পর্যন্ত লাভ করেছি তা সম্ভব হয়েছে শিলাস্তরের উপর নানা প্রকার দাগ এবং পাথরে পরিণত নানা জিনিষ পরীক্ষা করে। পৃথিবী এবং পৃথিবীতে প্রাণের প্রাচীনতা সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে পণ্ডিতেরা যে সব জিনিষের সাহায্য নিয়েছেন তাদের মধ্যে নানা রকমের হাড়, ফল, শামুকের খোলা, শিলীভূত বৃক্ষকাণ্ড, পাহাড়ের গায়ে আঁকা ছবি প্রভৃতির উল্লেখ করা চলতে পারে। প্রকৃতি পাথরের মধ্যে যে সব চিহ্ন লুকিয়ে রেখেছেন সেগুলি পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করে আমরা আদিম পৃথিবী সম্বন্ধে সামান্য কিছু জানতে পেরেছি। বহু বিজ্ঞানী তাঁদের সমস্ত জীবন এই খুঁটিনাটির পরীক্ষাতে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছিলেন বলেই অতীত পৃথিবী সম্বন্ধে এই সামান্য জ্ঞানটুকু আজ সম্ভব হয়েছে।

জীবের আগমন

কী করে পৃথিবীতে প্রথমে প্রাণের স্পন্দন আরম্ভ হল সে সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নেই বললেই চলে। তবে পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই বলে থাকেন যে প্রাণের উদ্ভব সর্বপ্রথম হয়েছিল সমুদ্রতীরের রৌদ্রতপ্ত অগভীর নোনা জলে। তীরভূমির কাছে প্রথম জন্মালেও জীব ক্রমে তার সুবিধের জন্য গভীর জলে আশ্রয় নিতে থাকে।

শিশু পৃথিবীর শিলাস্তরে আমরা প্রাণের চিহ্ন পাই না। পৃথিবীতে প্রথম যখন জল থেকে স্থল আলাদা হয় তখন প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে।

ধীরে ধীরে জীবের আগমন হতে থাকে। অতি নিকৃষ্ট জিনিষের মধ্যে প্রাণের প্রথম স্পন্দন আরম্ভ হয়েছিল বলেই আমাদের বিশ্বাস। উদ্ভিদ আর প্রাণীর মধ্যে পৃথিবীর একেবারে আদিবাসী হচ্ছে সামুদ্রিক শেওলা ও আগাছা এবং কয়েক রকমের জলজ কীট।

প্রাচীনতম জীবের মধ্যে উকুনের মত ছোট্ট একরকম পোকার কথা আমরা জানতে পেরেছি। এরা নানাপ্রকার সামুদ্রিক আগাছা আশ্রয় করে থাকত, চল্‌ত মাটি আঁকড়ে

ধরে। দরকার হলে শরীরকে কুণ্ডলী পাকিয়ে মুড়ে ফেলাও ছিল দেহের উপরে এদের শক্তির নিদর্শন।

আরও কয়েক লক্ষ বছর কাটল। পৃথিবীতে এল সামুদ্রিক বিছের মত শক্তিশালী প্রাণী। ঠিক মাছের মত কোন জীব এযুগেও জন্মাল না। এতদিন পৃথিবীর সব জীবই ছিল জলচারী। স্থলভাগে কী জীব কী উদ্ভিদ কিছুরই আবির্ভাব হয় নি।

পরের যুগে কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন ধরণের প্রাণীর সংগে পৃথিবীর সাক্ষাৎ ঘটল। এই নবাগত প্রাণীর যে শুধু চোখ আর দাঁতই ছিল তা নয়, সাঁতরাবার ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ। এই জীবই হচ্ছে পৃথিবীর আদি মাছ এবং মেরুদণ্ডওয়ালা সমস্ত জীবের মধ্যে সর্বপ্রথম। খুব দ্রুত এর বংশবৃদ্ধি ঘটেছিল বলে পণ্ডিতেরা এ সময়টার নাম দিয়েছেন মৎস্যযুগ। অবশ্য এখনকার মাছের সংগে এ সব প্রাণীর ছিল আকাশ পাতাল তফাৎ। তারা পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়ে গিয়েছে। তবে বর্তমান যুগের হাঙ্গরের সংগে এদের খানিকটা সাদৃশ্য হয় তো ছিল। সমুদ্রগর্ভে অবাধ বিচরণ, পরস্পরকে ভীষণ আক্রমণ

আদিম মৎস্য

প্রভৃতির দ্বারা এরা জলের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ণের সৃষ্টি করত।

মনে হয় মৎস্যযুগেও স্থলভাগ ছিল জীবহীন। স্যাঁৎসেঁতে কর্দমাক্ত মাটিতে অতি নিম্নস্তরের উদ্ভিদেরও উদ্ভব ঘটেনি। প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল শুধু জলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মৎস্য-যুগের শেষের দিকে আমরা জল থেকে স্থলের দিকে অতি ধীরে প্রাণীর গতিবিধি দেখতে পাই।

আরও অনেক লক্ষ বছর পরে পৃথিবী ভরে জলাভূমির রাজত্ব আরম্ভ হল। শেওলা, ফার্ণ, নানা ছোট বড় গাছ-পালায় পৃথিবী গেল ঢেকে। আজও এই সব প্রাচীন উদ্ভিদের শিলীভূত দেহাবশেষের সাক্ষাৎ মেলে। জলাভূমি থেকে নানা রকমের কীট মাটি আঁকড়ে ধরে স্থলের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। এরা প্রায় সকলেই ছিল বহুপদী। কারুর কারুর শতাধিক, কারুর কারুর আবার লক্ষাধিক পা ছিল বলে বিজ্ঞানীরা অনুমান করে থাকেন। এরাই হচ্ছে বর্তমান কীট-পতংগের পূর্বপুরুষ। এই সব পোকার মধ্যে সামুদ্রিক বিছে এবং কাঁকড়া জাতীয় জীবও ছিল। মনে হয় এদের থেকেই পরে মাকড়সা এবং স্থলের বিছের উৎপত্তি হয়েছে। আদিম কীট-পতংগের অনেকেই ছিল বিরাটাকার। এ যুগের শেষে স্থলে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের আগমন হল। পারিপার্শ্বিক জগতের সংগে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার জন্য প্রাণীদের দেহে ক্রমে কানকো, ফুসফুস্ প্রভৃতির উদ্ভব হতে লাগল।

মেরুদণ্ডী প্রাণীরা ঠিক সমুদ্রের মধ্যে বাস না করলেও প্রথম প্রথম জলের সংস্পর্শ ছাড়া বাঁচতে পারত না। তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই জলা জায়গার আশেপাশে কিম্বা খুব স্যাঁৎসেঁতে স্থানে জীবন কাটাত। জলের মধ্যেই তারা ডিম পাড়ত, আর জলের তলাতেই ডিম ফুটে তাদের বাচ্চা হত। এ যুগের জীবজন্তুরা শুষ্কস্থলে জীবন ধারণের উপযোগী ছিল না বললেই চলে। আর আজ-কালকার মত শুষ্ক স্থল তখন পৃথিবীতে ছিলও না। জল থেকে ডাঙা এবং ডাঙা থেকে জলে ভ্রমণ করবার ক্ষমতা বা উভচর বৃত্তি বোধহয় এ সময়েই তাদের মধ্যে প্রথম আসে। ধীরে ধীরে বহুকাল ধরে পৃথিবীব্যাপী বিরাট জলাভূমিগুলি গাছপালাসহ মাটিতে বসে যেতে থাকে। আগেকার স্যাঁৎসেতে আবহাওয়ার স্থানে আবির্ভাব হয় অতি রুক্ষ শুষ্ক আবহাওয়ার। কালক্রমে মাটির তলায় চাপা পড়া এই সব গাছপালাই কয়লার খনিতে পরিণত হয়েছে।

রুক্ষতা আর শুষ্কতা চলে গিয়ে বহুকাল পরে যখন আবার গরম ভিজে জলবায়ুর দিন এল তখন শুধু যে গাছপালার আকৃতিই বদলে গিয়েছিল তা নয় অনেক নতুন জীবেরও আগমন হয়েছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিলাস্তরগুলি পরীক্ষা করে আমরা শিশু পৃথিবীর কথা কিছু কিছু শিখেছি; তারই সাহায্যে আমরা জানি যে এ সময়কার প্রাণীরা কঠিন আবরণ দিয়ে ঢাকা ডিম পাড়ত। এরা আগের যুগের

উভচরের জীবন যাপন করত না। এরাই হচ্ছে পৃথিবীর আদি সরীসৃপ।

নানারকমের গাছ বিশেষ করে ফার্ণ ও অর্কিডের প্রাচুর্য আমরা এ সময় দেখি। তবে ফুলগাছ আর ঘাস এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে আসে নি। সরীসৃপ ছাড়া গুবরে পোকা প্রভৃতি বহুপ্রকারের কীট-পতংগ ছিল এ যুগের নতুন অধিবাসী। প্রাচীন সরীসৃপেরা আকারে ছিল খুবই বড়। বৃহদাকার কচ্ছপ, বিরাট কুমীর, অতিকায় গিরগিটি এবং সাপের সংখ্যা ছিল অগণিত। তা ছাড়া এমন সব অদ্ভুত জন্তু সেকালের পৃথিবীতে বাস করত যাদের বংশ পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গিয়েছে। ডাইনোসর নামক বিরাট ভয়াবহ প্রাণীর এযুগে ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য।

ডাইনোসর

এই সব অতিকায় জীবজন্তুরা যখন বনজংগল তোলপাড় করে ঘুরে বেড়াত তখন সম্পূর্ণ অন্য ধরণের এক সরীসৃপ তাদের মাথার উপর দিয়ে উড়তে থাকত। এই অদ্ভুত জীবও পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে গিয়েছে। এই সব প্রাণীর দেহের

অগ্রভাগ ছিল অনেকটা বাহুড়ের মত। তারা কখনও কীট-পতংগ কখনও পরস্পরকে আক্রমণ করে আকাশে তাণ্ডব বাধিয়ে তুলত। বেশী উঁচুতে ওঠবার ক্ষমতা ছিল না বলে গাছপালার মাঝ দিয়ে সাধারণতঃ তারা বিচরণ করত। প্রথমে মাটি থেকে খানিকটা লাফিয়ে উঠে তারা ডানা ছুটিকে প্যারাশুটের মত মেলে ধরত; ডানা ভাল করে খুলে গেলে এখান থেকে ওখানে উড়ে চলত। গিরগিটির পিঠে বাহুড়ের ডানা জুড়ে দিলে দেখতে যেমন হয় তারা ছিল তেমনি অদ্ভুত। উড়বার ক্ষমতা সম্পন্ন মেরুদণ্ডওয়ালা এই প্রাণীদের নাম হচ্ছে টেরোডেক্‌টিল্‌। পাখীর মত দেখতে হলেও এরা পাখীর পূর্বপুরুষ নয়।

টেরোডেকটিল

টেরোডেক্‌টিলের ডানায় পালকও ছিল না। পৃথিবীর প্রাচীন পক্ষিবংশের সংগে তাদের কোন সম্বন্ধও ছিল না। পাখীরা সরীসৃপজাতির সম্পূর্ণ অন্য এক শাখা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। যে ডাইনোসরের কথা আগে বলেছি তার কোন ক্ষুদ্রকায় জাতি পৃথিবীর এক আবহাওয়া থেকে অন্য আবহাওয়ায় চলে যাওয়ায় কালক্রমে তার দেহে পালক গজায়। ডাইনোসরের এই নতুন সংস্করণ থেকেই পাখীর উৎপত্তি হয়েছে। আদিম পাখীর উড়বার শক্তি ছিল না বললেই হয়। তারা লাফিয়ে লাফিয়ে চলত। ধীরে ধীরে ডানায় ভর দিয়ে হাওয়ায় ভাসবার ক্ষমতা তারা লাভ করে

এবং শেষ পর্যন্ত রীতিমত উড়তে শেখে। ডানার উপরকার আঁশগুলো বেড়ে বেড়ে এক নতুন আকার ধারণ করে এবং অবশেষে পালকে পরিণত হয়।

পাখীদের মতই জীবনযুদ্ধে টিকে থাকবার জন্য অনবরত সংগ্রাম করে স্তন্যপায়ী জীবেরা ক্রমে পারিপার্শ্বিক হিমশীতল আবহাওয়ার সংগে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। প্রথম প্রথম আঁশ তাদের শরীরকেও গরম রাখত বলে আমাদের বিশ্বাস। আগের যুগের প্রাণীদের মত তারা ডিম পেড়ে রেখে সর্বক্ষণ সেগুলোকে রক্ষা করতে ব্যস্ত থাকত না। ডিম-গুলোকে নিজেদের দেহে এমন ভাবে ঢেকে রাখত যে যতক্ষণ সেগুলো থেকে ছানা না বেরুত ততক্ষণ বোঝাই যেত না যে ডিমগুলো তাদের সংগে সংগে রয়েছে। তবে স্তন্যপায়ীদের বেশীর ভাগেরই ডিম পাড়ার বালাই ছিল না। সন্তান সশরীরে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হত। এ জাতির অন্তর্গত প্রায় সব জীবেরই রীতি সন্তানকে স্তন্যদান।

এ যুগ শেষ হবার পর বহু লক্ষ বছরের কোন ইতিহাসই খুঁজে পাওয়া যায় না। শিলাস্তর থেকে এ অন্ধকার যুগের কোন উপকরণই আজ পর্য্যন্ত আমরা সংগ্রহ করতে পারি নি। যেন হঠাৎ শিশু পৃথিবীর উপর একটা কাল পর্দা এসে নামল। যবনিকা সরে যাবার পর আমরা দেখতে পেলুম সরীসৃপ রাজত্বের অবসান ঘটেছে। ডাইনোসর আর টেরোডেকটিলের অস্তিত্বই পৃথিবী থেকে মুছে গেছে। ইতিমধ্যে এক

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা নেমে এসে খণ্ড প্রলয় করে কোথায় সরে পড়েছে যেন।

নতুন যে যুগ এল তা এল পৃথিবীতে এক তুমুল আলোড়ন নিয়ে। সারা জগৎ জুড়ে দেখা দিল আগ্নেয়গিরির উপদ্রব। মাটি ফুঁড়ে হিমালয় ও আল্পস মাথা তুলে দাঁড়াল। মহা সমুদ্র ও মহাদেশগুলি পৃথিবীর বুকে এঁকে দিল তাদের নতুন সীমারেখা। মানচিত্রে যে পৃথিবী আমরা আজ দেখি তার সূচনা আরম্ভ হল এ যুগেরই প্রথমে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন বর্তমান যুগ থেকে এ যুগের তফাৎ চল্লিশ হাজার লক্ষ থেকে আশী হাজার লক্ষ বছর।

এ যুগের গোড়াতে আবহাওয়া ছিল রুক্ষ এবং অতি শীতল। ক্রমে পৃথিবীতে উষ্ণতা আসতে থাকে এবং বাতাস বেশ গরম হয়ে ওঠে। কিন্তু এর পর আবার কয়েকটি তুষার যুগ পৃথিবীকে নাড়া দিয়ে যায়। বর্তমানে আমরা এমনি একটি তুষার যুগ থেকে পুনরায় উষ্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছি।

গরমের সাড়া পেয়ে পৃথিবীতে ঘাস দেখা দিল। তৃণভুক প্রাণীদের আবির্ভাব হল। নিরীহ প্রাণীদের উপর অত্যাচারী হিংস্র জীবেরও অভাব ঘটল না।

আদিম স্তন্যপায়ী জীবেরা সন্তানকে স্তন্যদানের কার্য শেষ হলেই তাদের ছেড়ে পালাত। বর্তমানে কিন্তু এ শ্রেণীর বহু জীব সংঘবদ্ধভাবে সামাজিক জীবন যাপন করতে শিখেছে। তারা দলে দলে ঘোরে, পরস্পরকে লক্ষ্য এবং

অনুকরণ করতে জানে, ভাবভংগীতে এবং চীৎকারে একে অন্যকে সাবধান করে দেয়। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে এসব ব্যাপার আগে আর কখনও দেখা যায় নি।

আজকের জগতে আমরা যে সব ফুল, ফল, গাছপালা এবং জীবজন্তুদের দেখে থাকি তাদের সূচনা এই যুগেই। অতীতের বিরাট আর কদাকার প্রাণী থেকে ক্রমোন্নতির ফলে আমরা দেখি উট, জিরাফ, হাতী, ঘোড়া, বাঘ প্রভৃতিকে। প্রাণীতত্ত্ববিদেরা স্তন্যপায়ী জীবদের প্রধানত ছ' ভাগে ভাগ করেছেন। শ্রেষ্ঠ ভাগের মধ্যে পড়েছে মানুষ, বনমানুষ ও বানর।

এতদিন ধরে পৃথিবীতে যে উষ্ণ যুগের রাজত্ব চলছিল তা অবশেষে শেষ হয়ে এল। আবার নাবল তুষার যুগের অন্ধকার। এই সব যুগ পরিবর্তনের সংগে তাল রেখে পুরাণো প্রাণীদের জায়গায় নতুন নতুন প্রাণীর আগমন শুনতে ভারী আশ্চর্য লাগে। অতীতের উষ্ণ আবহাওয়ায় পৃথিবীর গরম দেশগুলোর ঘন কর্দমাক্ত বনের মধ্যে আনন্দে ঘরকন্না করত কুৎসিৎ হিপোর দল, ইওরোপের উত্তর দিকে ঘুরে বেড়াত খড়গের মত দাঁতওয়ালা অতি নিষ্ঠুর বাঘের পাল। তুষার যুগের প্রথম দিকে শীতের আবহাওয়ার উপযোগী নতুন প্রাণী দেখা দিল পৃথিবীর বুকে। ঘন লোমওয়ালা গণ্ডার আর হাতী, কস্তুরী মৃগ আর বল্গা হরিণই তাদের মধ্যে প্রধান। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তুষারে ঢাকা মৃত্যুর মত কঠিন

কঠোর শীত ক্রমশঃ দক্ষিণ পৃথিবীর দিকে এগিয়ে চলতে লাগল। মাঝে মাঝে কয়েক সহস্র বৎসরের ক্ষীণ উষ্ণতা তারপর ভীষণ শীতের পুনরভিনয় ছিল একালের বিশেষত্ব।

প্রথম তুষার যুগের সুরু হল এখন থেকে ছ'লক্ষ বছরেরও আগে। আর চতুর্থ তুষার যুগের সবচেয়ে ভীষণ অবস্থা এসেছিল পঞ্চাশ হাজার বছরেরও পূর্বে। বিশ্বব্যাপী এই দারুণ শীতে যখন সমস্ত জগৎ বরফে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল সম্ভবত সেই সময় আদি মানব পৃথিবীর বুকে তার প্রথম পদক্ষেপ মুদ্রিত করে। এই আদি মানবের অস্তিত্বের যেটুকু প্রমান পাওয়া গিয়েছে তা তার দেহের অস্থি নয়, পাথরের অস্ত্র শস্ত্র। পাঁচ লক্ষ থেকে দশ লক্ষ বছরের পুরাণো ইতিহাসের যে সব উপকরণ পণ্ডিতেরা ইউরোপে উদ্ধার করেছেন তার মধ্যে এই ধরণের পাথরের টুকরো কিছু মিলেছে। মনে হয় মানুষ বা প্রায় মানুষেরই মত কোন জীব পাথর ঘসে এবং কেটে এই সব জিনিষ তৈরী করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল ধারাল পাথরের টুকরো দিয়ে যুদ্ধ বা শিকার। অস্ত্রশস্ত্রের সামিল এই প্রস্তরখণ্ডগুলিকে ঐতিহাসিকেরা বলেছেন আদি প্রস্তর। যে সব জীব সেগুলো ব্যবহার করত আমরাও তাদের বলব আদি মানব।

আদিম মানবের কাল্পনিক চিত্র

আদি প্রস্তর যুগ

বর্তমান মানুষের পূর্বপুরুষ বা আদি মানব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। তবে প্রাচীন মানবের যে সব দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছে তা থেকে মনে হয় গোড়ার দিকের মানুষ ছিল মোটামুটি দু' শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর মানুষ ছিল খুব লম্বা-চওড়া, তার মাথার খুলিও ছিল খুব বড়। এ শ্রেণীর মানবের সংগে আমেরিকার রেড্-ইণ্ডিয়ানদের অনেকটা মিল ছিল বলে বোধ হয়। তারা অসভ্য ছিল সন্দেহ নেই, তবে নেহাৎ নীচুদরের প্রাণী ছিল না। দ্বিতীয় জাতির মধ্যে কাফ্রী রক্ত ছিল বলে অনুমান হয়। তাদের দেহ-কংকাল দেখে মনে হয় দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যুশম্যান্ এবং হটেনটটের সংগে তাদের সাদৃশ্য ছিল। মানব-ইতিহাসের একেবারে গোড়াতেই যে বিভিন্ন জাতির মানুষ ছিল সে কথা ভাবলে আশ্চর্য না হয়ে থাকা যায় না।

চল্লিশ হাজার বছর আগের এই সব অসভ্য মানবের মধ্যে বর্তমান মানুষের প্রকৃতিও খানিকটা ছিল। তারা শামুকের খোলার তৈরী হার পরত, গায়ে রং মাখত, পাথর আর

হাড়ের মূর্তি নির্মাণ করত এবং মসৃণ পর্বতগাত্রে নানা জীবজন্তুর প্রতিকৃতি এঁকে সুকুমার শিল্পের চর্চা করত।

এই সব আদি মানুষেরা প্রথমে শিকার করেই জীবন ধারণ করত। লোমওয়ালা বুনো ঘোড়া, হাতীর পূর্বপুরুষ লোমশ ম্যামথ আর শক্তি-শালী বাইসন ছিল তাদের প্রধান শিকার। বর্শা আর বড় বড় পাথরের টুকরো দিয়ে তারা শিকার করত। বাহন-হিসেবে ঘোড়ার ব্যবহার তাদের অজ্ঞাত ছিল বলে মনে হয়। সম্ভবত কুকুর পুষতেও তারা শেখে নি। বোধ হয় এ সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে কুকুরের অস্তিত্বই ছিল না।

পর্বতগাত্রে আদি মানবের আঁকা ছবি

ঘর দরজা নির্মাণ তারা করত না; বোধ হয় পশুচর্মের তৈরী তাঁবুতে থাকত। কাদার তাল দিয়ে নানা রকম মূর্তি করত বটে, কিন্তু মাটির কোন রকম পাত্র তৈরী করতে জানত না। রান্না করবার বাসন কোসন তাদের ছিল না। কাপড় বুনতে বা চাষ করতে তারা শেখে নি। সাধারণতঃ দেহে রং মেখে উলংগ অবস্থাতেই তারা বিচরণ করত। তবে শীতের জন্য কখনও কখনও পশুর চামড়া এবং লোম পরিচ্ছদ হিসেবে ব্যবহার করত বলে মনে হয়।

নব প্রস্তর যুগ

কৃষিকার্য মানুষ কবে প্রথম সুরু করে এবং কখন সে প্রথম ঘর বেঁধে সংঘবদ্ধভাবে বসবাস করতে শেখে সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই অল্প। তবে এটুকু বলতে পারা যায় যে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় পনের হাজার বছর আগে থেকে পৃথিবীর আদিম অধিবাসীরা শিকারের সংগে সংগে সম্ভবত ভূমিকর্ষণ এবং পশুপালন এই দুইটি আবশ্যক কার্যও কিছু কিছু করত। শিকার, পশুপালন এবং কৃষিকার্য ছাড়া পালিশ করা পাথরের অস্ত্রশস্ত্র, নানা রকমের বাক্স, গাছের ছালের সূতো থেকে তৈরী মোটা কাপড় এবং কাষ চালান গোছের পাত্রাদি প্রস্তুত করবার কৌশলও বোধ হয় তাদের একেবারে অজানা ছিল না।

আদিম মানবের অস্ত্রশস্ত্র

মানুষ এ সময় ইতিহাসের এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছিল বললেই চলে। এ যুগের নাম দেওয়া যায় নবপ্রস্তর যুগ। নতুন যুগের অধিবাসীরা ধীরে ধীরে পৃথিবীর গরম দেশগুলির চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর তাদের আগমনের

আগেই তাদের শিল্প, তাদের ভূমিকর্ষণ প্রণালী এবং পশু-পালনের পদ্ধতি নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। খৃষ্টপূর্ব ১০,০০০ অব্দের কাছাকাছি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই নব-প্রস্তরযুগের সভ্যতা গ্রহণ করে। এখন যেখানে ভূমধ্যসাগর তখন সেখানে যে বিরাট প্রান্তরভূমি ছিল সম্ভবত তারই কোন অংশে বুনো গম জন্মাত। গমের বীজ চূর্ণ করে খাদ্য রূপে ব্যবহার সম্ভবত এই সময়ই আরম্ভ হয়। শস্য বপনের আগেই মানুষ শস্যচয়ন করতে শিখেছিল বললে বিশেষ ভুল হয় না।

কয়েকটি অতি প্রাচীন মাটির পুতুল

যীশুখৃষ্টের জন্মের দশ হাজার বছর আগের পৃথিবীর সঙ্গে বর্তমান পৃথিবীর যে মোটামুটি একটা ভৌগলিক সাদৃশ্য ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তবে সে সময়ের পৃথিবী ছিল এখনকার চেয়ে অনেক উর্বর; আর তার আবহাওয়া অনেক বেশী স্যাঁৎসেতে। এখন যেখানে বেরিং প্রণালী এসিয়াকে আমেরিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে সেকালে সম্ভবত সেই স্থানে ছিল এক স্থল-সংযোজক। বোধ হয় সে যুগেও এসিয়া এবং আমেরিকা ছিল পরস্পর সংযুক্ত।

সভ্যতার আদিভূমি—সুমেরিয়া, মিশর ও মহেঞ্জোদারো

অতীতের পৃথিবী ছিল অর্ধসভ্য মানবের গণ্ডগ্রামে পরিপূর্ণ। সর্বপ্রথম দক্ষিণ মেসোপোটেমিয়া এবং মিশরেই মানুষ সহর ও মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করে। টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস এই দুটি নদী দ্বারা বেষ্টিত যে দেশ প্রাচীন কালে তারই নাম ছিল সুমেরিয়া।

টিকোলো নাক, বাদামী রং সুমেরীয়দের দেখতে ছিল বেশ সুশ্রী। তারা এক রকম লিপিও আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু সে ভাষা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান আমাদের নেই। ব্রোঞ্জের ব্যবহার তারাই প্রথম করে। রোদে ইট শুকিয়ে তাই দিয়ে তারা উঁচু উঁচু মন্দির নির্মাণ করত। এ দেশের কাদা নানান কাযের পক্ষে উপযোগী। কাদার পাতেই তারা লিখত। পশুপালনেও তারা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল।

কাদার তৈরী পুতুল

তবে ঘোড়ার ব্যবহার সম্ভবত তারা জানত না; চামড়ার ঢাল এবং বর্শার সাহায্যে মাটিতে দাঁড়িয়েই যুদ্ধ করত। তাদের পরিচ্ছদ হত পশমের তৈরী। মাথা সম্পূর্ণ কামিয়ে ফেলা ছিল তাদের সমাজের একটা রীতি।

ছবি এঁকে মনের ভাব জানানোই ছিল প্রাচীন লিপি কৌশলের মূলকথা। নব প্রস্তর যুগের আগেই কোথাও কোথাও মানুষ লিখতে শেখে। সুমেরিয়াতে কাদার উপর সরু কাঠের ফলা দিয়ে হাল্কা ভাবে লেখা হত। কিন্তু কাদা শুকিয়ে গেলে অনেক সময় অক্ষরের আকৃতিই যেত বদলে। আবার কাদার উপর বেশী জোর দিয়ে অক্ষর ফোটাবার অসুবিধেও ছিল। প্রাচীন মিশরে আমরা লেখার যে পদ্ধতি দেখতে পাই তা এর চেয়ে অনেক ভাল। মিশরবাসীরা কখনও কখনও দেওয়ালের গায়ে খোদাই করে লিখত ; তবে বেশীর ভাগ লোক লিখত প্যাপিরাস গাছের পাতায়। ফলে সুমেরীয় লিপি অপেক্ষা মিশরীয় লিপি হত অনেক স্পষ্ট।

মিশরের লোকেরা নানা জিনিষের ছবি এঁকে মনের ভাব ব্যক্ত করত। এক কথায় তাদের লিপিকে বলা চলে চিত্র-

চিত্র-লিপি

লিপি। সুমেরিয়াতে কাদার পাতের উপর সরু কাঠের ফলা দিয়ে কোনাকার লিপি উৎকীর্ণ করা হত বলে বিশে-ষজ্ঞেরা তার নাম দিয়েছেন কিউনিফর্ম বা কোনাকার লিপি। প্রাচীন জগতের সমস্ত বর্ণমালাই মিশরের চিত্রলিপি এবং সুমেরিয়ার কোনাকৃতি লিপি থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

তবে চীনে চিত্রলিপিই রয়ে গেছে। তা থেকে বর্ণমালার উৎপত্তি হয় নি।

মেসোপোটেমিয়ায় বহুকাল ধরে চিঠিপত্র, দলিল, হিসাব প্রভৃতি লেখা হত এক রকম খুব মজবুত টালীর উপর। এ সব লেখা থেকে তখনকার দিনের অনেক খবর আমরা জানতে পেরেছি।

সম্ভবত অতীত যুগের অন্যান্য দেশের নাগরিক জীবন ছিল অনেকটা মিশর ও সুমেরিয়াবাসীদের জীবনেরই মত। কিছুদিন আগে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত মহেঞ্জোদারো নামক স্থানে এক অতি প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সভ্যতা যে কতদিন আগেকার সে সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। অনেকে মনে করেন খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ তিন হাজার থেকে চার হাজার বছর আগে এ সভ্যতার অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এ কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন যে ভারতের এই প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা মিশর ও মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতার সমসাময়িক, কিম্বা আরও প্রাচীন। অনেকে বিশ্বাস করেন এই প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে সুমেরীয় সভ্যতার আদান প্রদান চলত। মহেঞ্জোদারোর সভ্যতায় নাগরিক জীবন যে খুবই উন্নত হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ আমরা পাই তখনকার

মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত কুঠার

মৃৎপাত্রে খোদিত ষণ্ড মূর্তি

দিনের ঘর বাড়ি, নগর নির্মাণ, জল নিকাশের প্রণালী, স্নানাগার ইত্যাদিতে।

মিশরের সভ্যতার প্রায় দু তিন হাজার বছরের পর মধ্য-আমেরিকায় মায়া সভ্যতা গড়ে ওঠে। এ সভ্যতার ঐতিহাসিক উপকরণ হিসেবে আমরা খুব বেশী কিছু পাই নি। তবে মনে হয় এখানেও নাগরিক জীবন ছিল অনেকটা মিশর ও সুমেরিয়ার অনুরূপ।

দিন, রাত্রি, বর্ষ প্রভৃতির চিহ্ন, মায়া সভ্যতা

টাকাকড়ির ব্যবহার সে কালে ছিল না। দ্রব্য বিনিময়ের দ্বারা ব্যবসা চলত। খুব ধনীরাই কেবল সোনা, রূপো এবং বহুমূল্য প্রস্তর ব্যবহার করতেন। সামাজিক জীবনের মর্মস্থল ছিল সেকালের মন্দিরগুলি। নানা দেশে তাদের আকারও ছিল বিভিন্ন। সুমেরিয়ার মন্দিরগুলি ছিল খুব উঁচু। মন্দিরের চূড়ো থেকে নক্ষত্র পর্যবেক্ষন করা হত। মিশরের মন্দিরগুলি খুব উঁচু হত না বটে, তবে তাদের পরিধি হত ঢের বড়। সুমেরিয়ায় পুরোহিতেরাই

চক্র, মায়া সভ্যতা

হতেন রাজা। মিশরে কিন্তু দেশের যিনি রাজা তিনি হতেন পুরোহিতের চেয়েও বড়। এক কথায় জন সাধারণ রাজাকে দেবতা বলে মনে করত। দেবতা-বিশেষ মিশর সম্রাটকে বলা হত ফ্যারো।

প্রাচীন জগতের অধিবাসী

খৃষ্টপূর্ব ৬০০০ থেকে ৩০০০ বছরের মধ্যে শুধু মিশর এবং মেসোপোটেমিয়াতে নয় পৃথিবীর যেখানে যেখানে কর্ষনযোগ্য ভূমি এবং সারা বছরের খাদ্য মিলত মানুষ সেখানেই কৃষি-কার্যকে জীবিকার প্রধান উপায় বলে অবলম্বন করে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে চাইত। ঘুরে ঘুরে শিকার করার কষ্ট তারা যতদূর সম্ভব পরিহার করতে চেষ্টা করত। উত্তর টাইগ্রীসের পাশে এসিরীয় জাতি ইতিপূর্বেই নগর নির্মাণে লেগে গিয়েছিল। পশ্চিম এসিয়ার উপত্যকাগুলিতে, ভূমধ্য সাগরের দ্বীপমালা এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে গ্রাম্য জীবন ক্রমেই সভ্যতার দিকে এগিয়ে চলেছিল। ভারত এবং চীন দেশ এ সময় মানব সভ্যতার মাপকাটিতে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। ইওরোপের যে সব অংশে মৎস্যপূর্ণ বড় বড় হ্রদ ছিল সেখানকার অধিবাসীরা জলের উপর মাচা বেঁধে বাড়ি ঘর তৈরী করে সেখানে দিব্যি ঘরকন্না করত। তাদের প্রধান কায ছিল মাছধরা। তবে জীবনধারণের জন্য কৃষিকর্ম এবং শিকারও তাদের করতে হত বৈ কি।

প্রাচীন পৃথিবীর বহুস্থানেই কিন্তু সে যুগে স্থায়ী বসবাস সম্ভব হত না। কঙ্করময় প্রদেশ এবং মরুভূমি, ঘন বন,

শীত-গ্রীষ্ম এবং বৃষ্টির অতি প্রাচুর্য বহুস্থানেই মানুষকে স্থায়ী বসবাসে বাধা দিত। এই জন্যই আমরা দেখতে পাই যে যখন একদিকে পশ্চিম এসিয়ার বড় নদীগুলির উপত্যকা আশ্রয় করে কৃষিজীবনের পত্তন আরম্ভ হয়েছিল ঠিক সে

হ্রদের বুকে বাসগৃহ

সময় অন্য অনেকগুলি স্থানে প্রাকৃতিক কারণে মানুষ যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। তৃণভূমির খোঁজে শীত থেকে গ্রীষ্মে এবং গ্রীষ্ম থেকে শীতে একস্থান থেকে অন্যস্থানে বিচরণই হচ্ছে যাযাবর জীবনের মূলকথা। অনেক দিক থেকে মুক্ত যাযাবর জীবন ছিল গৃহবাসীদের জীবনের চেয়ে অধিকতর বৈচিত্র্যময়। চিরভ্রাম্যমান বলে যাযাবরেরা হত নিজেদের ক্ষমতায় ঢের বেশী বিশ্বাসী। দলের নেতার থাকত অসীম ক্ষমতা। দলের চিকিৎসকের প্রতিপত্তিও নেহাৎ কম হত না। নানা ধাতুর ব্যবহার সম্বন্ধে যাযাবরদের জ্ঞান বোধ হয় সাধারণ লোকের চেয়ে বেশীই ছিল। পাহাড়ের অলিগলি দিয়ে

তাদের প্রচুর ঘুরতে হত। সম্ভবত প্রাচীন কোন যাযাবর জাতিই ব্রোঞ্জ ও লোহা গলাবার পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রথম আবিষ্কার করে। তখনকার সভ্যতার কেন্দ্র পশ্চিম এসিয়া থেকে বহুদূরে অবস্থিত মধ্য ইওরোপে অতি প্রাচীন লোহার কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। মনে হয় এদিককার কোন যাযাবর জাতি সমসাময়িক সভ্যতার ছোঁয়াচ না পেয়েও এগুলি নির্মাণ করতে পেরেছিল।

প্রাচীন মিশরে প্রাপ্ত লৌহের অস্ত্র

অপর পক্ষে গ্রামে বা সহরে যারা স্থায়ীভাবে বসবাস করত তারাই প্রথম জীবন ধারণের উপকরণ হিসেবে মাটির পাত্র, কাপড়-চোপড় এবং অন্যান্য অনেক জিনিষ আবিস্কার করে। ব্যবসা আর লুটপাট দুইই ছিল তখনকার লোকের স্বাভাবিক বৃত্তি। সুমেরিয়াতে আমরা পাশাপাশি মরুভূমি এবং উর্বরদেশ দেখতে পাই। মনে হয় এ দেশের যাযাবরেরা প্রায়ই গ্রামের কাছে এসে তাঁবু ফেলত আর গ্রামবাসীদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের ফাঁকে ফাঁকে এটা ওটা চুরি করতেও দ্বিধা করত

বৃক্ষের উপর বাসগৃহ

না। আধুনিক জিপসীদের সঙ্গে এই সব আদিম যাযাবরদের খুব বেশী মিল ছিল বললেও ভুল হয় না। তারা মূল্যবান প্রস্তর, ধাতু আর চামড়ার জিনিষ গ্রামবাসীদের দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিত। এ সবের বদলে তারা নিত মাটির পাত্র, কাঁচ, কাপড়-চোপড় এবং অন্যান্য ছাঁচে ফেলে তৈরী জিনিষ।

সুমেরিয়া এবং মিশরে যখন স্থায়ী বসবাস আরম্ভ হয়ে গেছে সে সময় পৃথিবীতে অন্ততঃ তিনটি বিভিন্ন যাযাবর জাতির অস্তিত্ব ছিল। পশ্চিমের জঙ্গলময় প্রদেশে বিচরণ করত একজাতির সুদৃশ্য লোক। শিকার এবং পশুচারণই ছিল তাদের কার্য। তাদের বলা হত আর্য। পূর্ব এসিয়ার বন্ধ্যা প্রান্তরগুলিতে ঘোরাফেরা করত আরও কতগুলি বিভিন্ন যাযাবর জাতি। তাদের গায়ে ছিল মঙ্গল রক্ত। তাদের মধ্যে হুনেরা প্রথমে ঘোড়াকে পোষ মানাতে শেখে। আর আরব এবং সিরিয়ার মরুভূমিতে তামাটে রংএর কয়েকদল লোক ঠিক একই সময় ভেড়া, ছাগল এবং গাধা চরিয়ে এক তৃণভূমি থেকে অন্য তৃণভূমির খোঁজে অনবরত ঘুরত। এদের গায়ে ছিল সেমিটিক রক্ত। এরাই প্রথম পশ্চিম এসিয়ার সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। সভ্যজাতিদের সঙ্গে যখন তাদের প্রথম দেখা হল তখন তারা হয়ে উঠল সওদাগর ও ডাকাত দুইই। শেষে তাদের মধ্যে শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব হওয়াতে তারাই আবার সভ্য জাতিদের জয় করে রাজা হয়ে বসল।

খৃষ্টপূর্ব ২৭৫০ অব্দে সারগণ নামক এই রকম একজন সেমিটিক নেতা সমস্ত সুমেরিয়া জয় করে পারস্য উপসাগর থেকে ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। তাঁর এই বিরাট সাম্রাজ্য তুশ' বছর পর ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। এর পর এমোবাইট নামক আর একটি সেমিটিক জাতি ধীরে ধীরে সুমেরিয়াকে জয় করে নিতে থাকে। তারাই প্রথমে তাদের রাজধানী ইউফ্রেটিশ নদী তীরস্থ ব্যাবিলন নামে একটি ছোট্ট গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করে। কালক্রমে এই নগণ্য গ্রামের নাম থেকেই তাদের বিরাট সাম্রাজ্যের নাম হয় ব্যাবিলন সাম্রাজ্য।

মেসোপোটেমিয়ায় প্রাপ্ত প্রাচীন নারীমূর্তি।

মেসোপোটেমিয়াকে যাযাবর জাতিগুলি যত সহজে আক্রমণ করতে পেরেছিল নীলনদের সঙ্কীর্ণ উপত্যকাকে কিন্তু তত সহজে পারে নি। তবু সেমিটিক যাযাবরেরা মিশরের খানিকটা জয় করে নতুন এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে। মিশরের এই বিজাতীয় ফ্যারোদের বলা হত হিকসস্ বা রাখাল-রাজা। হিকসসরা বেশ কয়েক শতাব্দী প্রতাপের সঙ্গে রাজত্ব করেন। পরে খৃষ্টপূর্ব ১৬০০ অব্দের কাছাকাছি মিশর থেকে তাঁদের বহিস্কৃত করা হয়।

সুমেরিয়াতে কিন্তু সেমিটিক যাযাবরেরা চিরকালের

জন্যই এসেছিল। পরস্পর বিবাহের ফলে দুটি জাতি এক হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আচার, ব্যবহার ও ভাষায় সমগ্র ব্যাবিলন সাম্রাজ্য সেমিটিক হয়ে গিয়েছিল বললেই চলে।

ফিনিশিয়া

নৌকো আর জাহাজের ব্যবহার সম্ভবত মানুষ পঁচিশ ত্রিশ হাজার বছর আগে করতে শেখে। গোড়ার দিকে ঝুড়ির মত গোল নৌকো কিম্বা বড় মাটির গামলার চলনই ছিল বেশী। চামড়ার নৌকোর ব্যবহারও কোন কোন স্থানে দেখতে পাওয়া যেত। নৌবিদ্যায় আর একটুখানি এগুলে মানুষ গাছ কুঁদে নৌকো বানাতে শিখল। আরও কিছুদিন পর পৃথিবীর বড় বড় নদীগুলিতে এবং সমুদ্রের স্থানে স্থানে বড় পালের নৌকোর প্রচলন আরম্ভ হল। পুরাকালের জাহাজগুলো আসলে ছিল নৌকো। বহু দাঁড়ের সাহায্যে তীর ঘেঁসে তাদের চালান হত। ঝড়ের আগমন-বার্তা পেলেই তাদের বন্দরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিরাপদ করবার চেষ্টা চলত।

পিরামিড তৈরী হবার অনেক আগেই লোহিত সমুদ্রে জাহাজের চলাচল ছিল। যীশুখৃষ্টের জন্মের ৭০০০ বছর আগেও আমরা ভূমধ্যসাগর এবং পারস্যোপসাগরে জলযানের খবর পাই। পশ্চিম এসিয়ার সেমিটিক জাতিরা ইতিমধ্যে সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ করে দিয়েছিল। ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীরে টায়ার ও সীডন নগরের বন্দরগুলি তারাই নির্মাণ করেছিল।

হাম্মুরাবি যখন ব্যাবিলনে রাজত্ব করছিলেন তখন সবগুলি বন্দরেই তারা ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই সব সেমিটিক নাবিকদের বলা হত ফিনিশিয়ান্। প্রচীন জগতের সমুদ্রগামী জাতিগুলির এরা অন্যতম। পরে স্পেনদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে ফিনিশিয়ান্রা জিব্রালটার প্রণালীর মধ্যে দিয়ে অনেক নৌ-অভিযান চালায়। আফ্রিকাতেও তারা বসতি স্থাপন করেছিল। সেই বসতিগুলির মধ্যে কার্থেজের কথা কেই বা না জানে? এমন কি টিনের খনির খবর পেয়ে বিলেতের মত দূর দেশের সঙ্গেও তারা বাণিজ্য করতে পেছোয় নি।

ইজিয়ান সভ্যতা

ফিনিশিয়ানদের অভ্যুত্থানের আগেই ভূমধ্যসাগরের দ্বীপমালায় এবং তীরে নগর নগরী গড়ে ওঠে। এগুলি ছিল ইজিয়ানদের। ইজিয়ানরা কিন্তু গ্রীক নয়। গ্রীকেরা আসে ঢের পরে। ক্রীট দ্বীপের নসস্ নামক স্থানে ছিল তাদের সব চেয়ে বড় এবং প্রসিদ্ধ সহর।

নসসের ইতিহাস মিশরের ইতিহাসের চেয়ে কম প্রাচীন নয়। যীশুখৃষ্টের জন্মের চার হাজার বছর আগেই সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে উভয় দেশের বাণিজ্য চলতে থাকে। খৃষ্টের জন্মের আড়াই হাজার বছর আগে ক্রীট্-সভ্যতা উন্নতির চরম অবস্থায় এসে পৌঁছোয়।

নসসকে বড় সহর না বলে ক্রীট সম্রাট এবং তাঁর অনুচরদের এক বিরাট প্রাসাদ বললেই হয়। প্রথমে তাকে সুরক্ষিত করবার প্রয়োজন হয়নি। পরে ফিনিশিয়ানরা যখন ক্ষমতাশালী হয়ে উঠ্‌ল এবং নিষ্ঠুর গ্রীক জলদস্যু যখন এগিয়ে আসতে লাগল তখনই নসস্‌কে সুরক্ষিত করবার নানা বন্দোবস্ত করা হয়।

যেমন মিশরের সম্রাটকে বলা হত ফ্যারো, তেমনি ক্রীট্ রাজের পোষাকী উপাধি ছিল মাইনোস্। তাঁর রাজ্য ছিল

নসসের প্রাসাদের মধ্যে। এই প্রাসাদের মধ্যে দিয়ে নদী বয়ে যেত এবং তাতে স্নানের সমস্ত রকম সুবিধে ছিল। অতীতের অন্য কোন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আমরা ঠিক এমন জিনিষ দেখি না। এই প্রাসাদের ভিতরেই রাজা যাবতীয় আমোদ আহ্লাদের অনুষ্ঠান করতেন। প্রাসাদের মধ্যে ছিল উন্মুক্ত প্রাঙ্গন। তাতে ষাঁড়ের লড়াই হত। ষাঁড়ের সঙ্গে যারা যুদ্ধ করত তাদের পোষাকের সঙ্গে বর্তমান স্পেনের ষণ্ডযোদ্ধাদের পোষাক-পরিচ্ছদের যথেষ্ট মিল ছিল। তা ছাড়া সেখানে মল্লক্রীড়া প্রভৃতি তো হতই। সেখানকার স্ত্রীলোকদের পোষাক ছিল অনেকটা ইওরোপের আধুনিক মহিলাদের পোষাক পরিচ্ছদের মত। ক্রীটের অধিবাসীদের তৈরী কাপড়, পাথর ও হাতীর দাঁতের কায, গহনা প্রভৃতি সত্যিই খুব সুন্দর। লিখতেও তারা জানত। দুঃখের বিষয় আমরা এখন পর্যন্ত সে সব লেখা পড়তে পারি নি।

প্রাচীন কারুকার্য খচিত পাত্র।

মিশর, ব্যাবিলন, এসিরিয়া

মিশরের লোকেরা বিদেশী হিকসস্‌দের মোটেই পছন্দ করত না। সম্ভবত যীশুখৃষ্টের জন্মের ১৬০০ বছর আগে এই ঘৃণিত বিদেশীদের বিরুদ্ধে এক বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। তার ফলে সে দেশে স্থরু হল এক নতুন রাজত্বের সূচনা। হিকসস্‌ আক্রমণের পূর্বে মিশরে একতার অভাব ছিল। বিদেশী শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে দেশে যে শুধু একতা এল তা নয়, সামরিক ক্ষমতাও গেল অনেক বেড়ে। নতুন ফ্যারোরা হলেন বেশ শক্তিশালী। হিকসসদের কাছ থেকে তাঁরা যুদ্ধে ঘোড়ায় টানা রথের ব্যবহার শিখেছিলেন। দেশ জয়ের বাসনা হয়ে উঠেছিল প্রবল। তৃতীয় টট্‌মেস এবং তৃতীয় এমনো-ফিসের রাজত্বকালে মিশর এসিয়াতে ইউফ্রেটিস নদীর ধার পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করে ফেলেছিল।

এবার আরম্ভ হল মিশর এবং মেসোপোটেমিয়ার মধ্যে বহুদিন-ব্যাপী এক যুদ্ধ। এই যুদ্ধ চলেছিল প্রায় এক হাজার বছর ধরে। যুদ্ধের প্রথম দিকে মিশরের অবস্থা ছিল বেশ ভাল। সপ্তদশ বংশের সম্রাট তৃতীয় টট্‌মেস, তৃতীয় ও চতুর্থ এমনোফিস, রানী হাতস্থ এবং উনবিংশ বংশের র‍্যামেসেসের সময় মিশর যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল। অবশ্য এই

সমৃদ্ধির মাঝে একটু আধটু দুঃসময় যে একেবারেই আসে নি তা নয়। মেসোপোটেমিয়াতে প্রধান ক্ষমতা ছিল ব্যাবিলনের হাতে; পরে কিছুদিনের জন্য হিটাইট্‌ এবং সিরিয়ানরাও রাজত্ব করেছিলেন। নিনেভার এসিরীয়দের ক্ষমতা জোয়ার ভাটার মত একবার বাড়ত আবার কমে যেত। কখনও তাদের নিজেদের রাজধানী হয়ে পড়ত শত্রুপদানত, কখনও আবার তারা নিজেরাই ব্যাবিলনের উপর রাজত্ব করে মিশর আক্রমণ করতে দ্বিধা করত না। মিশর, সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া এবং পশ্চিম এসিয়ার মধ্যে যে সব যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটেছিল তার বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়, তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে অশ্বযুক্ত রথই ছিল এ যুগের যুদ্ধের সব চেয়ে বড় উপকরণ। যুদ্ধে অশ্ব ও রথের ব্যবহার এ-সময় মধ্য এসিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

প্রাচীন মিশরের অশ্বযান

সুদূর অতীতের আবছা আলোতে আমরা এসিয়ার বীরচূড়ামণি টিগলথ পিলেজারের কার্যকলাপও কিছু কিছু দেখি। ক্রমে এসিরিয়া সে সময়কার সব চেয়ে ক্ষমতাশালী শক্তিতে পরিণত হয়। তৃতীয় টিগলথ পিলেজার পুনর্বার ব্যাবিলন জয় করে নতুন এসিরীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। সারগনের ছেলে সেনা-

ক্যারিব এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মিশরের প্রান্তে এসে পৌঁছান কিন্তু সেখানে মারাত্মক প্লেগের আক্রমণে ক্ষতি-গ্রস্ত হয়ে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। সেনাক্যারিবের নাতি অস্থুরবনীপাল তাঁর পিতামহের আরব্ধ কায শেষ করেন। মিশর জয় করে একজন বিদেশী রাজার স্থানে তিনি অন্য বিদেশী রাজা বসালেন।

দশ শতাব্দীব্যাপী এই সব যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে মিশর সাম্রাজ্যের সঙ্কোচ ও প্রসার পুনঃ পুনঃ ঘটতে দেখা যায়। এদিকে পশ্চিম এসিয়ার ব্যাবিলনীয়, এসিরীয়, হিটাইট্, সিরীয় প্রভৃতি জাতিগুলি ক্রমাগত পরস্পরকে আক্রমণ করতে চেষ্টা করছিল। এসিয়ার আর একটু পূব দিকে আমরা ইজিয়ানদের লিভিয়া, ক্যারিয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য দেখতে পাই। যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় ১২০০ বছর আগে উত্তর-পূব এবং উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে পৃথিবীর মানচিত্রে কতগুলি নতুন নামের উদয় হল। এই সব নাম হচ্ছে কয়েকটি বর্বর জাতির। তাদের সৈন্যেরা লোহার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করত। উত্তর দিক থেকে এই সব জাতি ইজিয়ান এবং সেমিটিক সভ্যতাকে বিপর্যস্ত করে তুলল। তারা বিভিন্ন ভাষা বলত বটে, তবে মনে হয় এক আর্য ভাষা থেকেই কালক্রমে তাদের ভাষা বিভিন্ন হয়ে যায়।

এদিকে কৃষ্ণসাগর আর কাস্পিয়ান হ্রদের উত্তর-পূব

তীরে মিড্ এবং পারসীকদের দেশ জয়ের বাসনা উগ্র হয়ে উঠেছিল। উত্তর পশ্চিম থেকে এগিয়ে আসছিল আরমেনিয়ানরা। আর উত্তর-পশ্চিম দিকের সমুদ্রকূলের পার্বত্য প্রদেশ থেকে বল্কান দেশের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল সিমেরিয়ান, ফ্রিজিয়ান এবং গ্রীক প্রভৃতি হেলেনিক জাতি। এই সব আর্যেরা পূবে এবং পশ্চিমে দুদিকেই ডাকাতি এবং লুঠতরাজকে পেশা করে সভ্য জাতিদের ব্যস্ত করে তুলেছিল। শুধু এ কথা বললেও কম বলা হয়। পূবে এতদিন পর্যন্ত তারা শুধু ডাকাতের কাযই করছিল কিন্তু পশ্চিমে নগরের পর নগর ইজিয়ানদের হাত থেকে তাদের অধিকারে চলে আসে। সুসভ্য ইজিয়ানেরা যে শুধু বিজিত হল তা নয়, নিজেদের দেশ থেকেও বিতাড়িত হল। এট্রুসকান নামে তাদের একটি শাখা সম্ভবত এসিয়ার পশ্চিম প্রান্ত থেকে সমুদ্র দিয়ে মধ্য-ইটালীর জঙ্গলময় প্রদেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে। আর একটি শাখা ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-পূব তীরে নগর পত্তন করে বসবাস সুরু করে। এরাই পরে ইতিহাসে ফিলিস্টাইন নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

খৃষ্টপূর্ব ৬০০ সাল পর্যন্ত আর্যদের আগমন মিশর এবং মেসোপোটেমিয়ায় এমন কিছু পরিবর্তন আনে নি। উত্তর থেকে ভীষণ গ্রীক জলদস্যুদের আক্রমণে ইজিয়ানদের পলায়ন, এমন কি নসসের ধ্বংস বোধ হয় সুদূর অতীতের একটা

উপদ্রব বলেই মিশরবাসী এবং ব্যাবিলনের লোকেরা মনে করত। অতীতের এই সব ভয়াবহ যুদ্ধ এবং লুঠতরাজের স্মৃতি তাদের কাছে অতিশয় ক্ষীণ হয়ে এসেছিল।

মিশরে পুরাতন যুগের স্মৃতিমন্দিরগুলির পাশাপাশি নতুন নতুন প্রাসাদ ও অট্টালিকার সৃষ্টি হচ্ছিল। পিরামিড গুলির বয়স এরই মধ্যে হয়ে গিয়েছিল প্রায় তিন হাজার বছর। কার্ণাক আর লুক্সরের মন্দিরগুলি এ সময়েই নির্মিত হয়। মেসোপোটেমিয়াতেও নিনেভার স্মৃতিসৌধ, মনুষ্য-মস্তকযুক্ত পাখাওয়ালা অদ্ভুত ষাঁড়, রাজারাজরাদের নিখুঁৎ প্রতিমূর্তি, রথের ছবি, সিংহশিকারের অপূর্ব চিত্র প্রভৃতি বস্তুগুলি যীশুখৃষ্টের জন্মের আগের ১৬০০ থেকে ৬০০ বছরের মধ্যে নির্মিত হয়। ব্যাবিলনের সমৃদ্ধিও ঘটেছিল এই যুগে।

পানপাত্রের গায়ে আঁকা পশুমূর্তি

মিশর ও মেসোপোটেমিয়া থেকে এ যুগের বহু দলিলপত্র, হিসেব-নিকেশ, গল্প, কবিতা, চিঠি প্রভৃতি আমরা পেয়েছি। সেগুলি পড়ে আমরা জানতে পেরেছি যে তখনকার দিনে ধনী নাগরিকদের জীবনও প্রায় এ কালের মতই ছিল। ব্যাবিলন ও থিবসের ধনী অধিবাসীরা যে রকম থাকত তা আলোচনা করলে মনে হয় যে বর্তমান যুগের অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা বোধহয় তাদের চেয়ে খুব বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে নি। তারা সুসজ্জিত অট্টালিকায় বাস করত, চমৎকার কাপড় ও বহুমূল্য মণিমাণিক্য ব্যবহার করত। নাচগান, খাওয়া দাওয়া ও

আমোদ প্রমোদ এখনকার চেয়ে কম হত না। তাদের চাকরবাকরেরা নেহাৎ কম কায়দাদুরস্ত ছিল না। চিকিৎসক ও দন্তচিকিৎসকদের বড়লোকের কাছে আদর ছিল খুব বেশী। ধনীরা এদিক ওদিক বেড়াতেন; তবে এখনকার মত দীর্ঘ ভ্রমণ

নাচ গানের উৎসব, পিরামিডের গায়ে আঁকা প্রাচীন চিত্র থেকে

সে যুগে সম্ভব হত না। গরমের দিনে ইউফ্রেটিস এবং নীলে নৌকো-বিহার ছিল ধনীদের একটা আকাঙ্ক্ষার জিনিষ।

ঘোড়ার ব্যবহার হত যুদ্ধের রথে এবং রাজ্যের শোভাযাত্রা গুলিতে। ধাতু হিসেবে তামা এবং ব্রোঞ্জের ব্যবহারই হত বেশী। পশম ও সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের প্রচলন ছিল যথেষ্ট। কাঁচের প্রচলন ছিল; সুন্দর রং করে কাঁচের পাত্রাদি তৈরী করা হত। তবে কাঁচের জিনিষগুলি সাধারণতঃ আকারে হত খুব ছোট। কাঁচ পরিষ্কারের কৌশল সম্ভবতঃ মানুষ এ যুগেও ভাল শেখে নি। চোখে কাঁচের ব্যবহারের কোন প্রমাণ পাই না। সৌখিন লোকেরা সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধত, কিন্তু চসমা পরত না।

খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৬০০ বছর আগেই মিশর এবং পশ্চিম এসিয়ার এই সব সমৃদ্ধিশালী রাজ্যগুলির পতন ঘটে। পরের যুগে ইতিহাসে পয়লা নম্বরের স্থান অধিকার করে নিল আর্যদের প্রথম সাম্রাজ্য পারস্য দেশ।

প্রাচীন আর্য-সভ্যতা

এখন থেকে চার হাজার বছরেরও আগে মধ্য এসিয়া ও দক্ষিণ ইউরোপে কতগুলি জাতি ঘোরাফেরা করত। তাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ থাকলেও তারা পরস্পরের নিকট নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করতে পারত। প্রত্যেক জাতির বিভিন্ন ভাষা ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সেগুলির মধ্যে মিল ছিল এত বেশী যে কায চালাবার জন্য একটি সাধারণ কথ্য ভাষা তৈরী করে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। যে সময়ের কথা বলছি তখন সংখ্যায় সম্ভবত তারা খুব বেশী ছিল না এবং সভ্য জগতে তাদের অস্তিত্ব জানা ছিল কিনা সন্দেহ।

পৃথিবীর ইতিহাসে কিন্তু আর্যদের যত নাম অন্য কোন জাতিরই তত নয়। তারা ছিল সমতল প্রান্তরের লোক। প্রথমে অশ্বের ব্যবহার তারা জানত না, কিন্তু গো-মহিষ প্রভৃতি পালন করত। ভ্রমণ কালে তাঁবু এবং অন্যান্য জিনিষপত্র নিয়ে চলত ষাঁড়ে-টানা গাড়িতে। কোন স্থানে বেশী দিন থাকতে হলে তারা মাটির ঘর তৈরী করে নিত। দলের নেতার মৃত্যুর পর তার দেহ দাহ করা হত; আর চিতাভস্ম সংরক্ষিত হত বড় বড় গোল মাটির পাত্রে। এই সব মাটির পাত্রের চারিদিকে গড়া হত মাটির ঢিবি। কিছুদিন

পর ঢিবির তলায় পাত্রটি চাপা পড়ে যেত। আর্যদের আগে অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণকায় যে সব লোক সেখানে বাস করত তারা কিন্তু মৃতদেহকে বসিয়ে তার উপর মাটি চাপা দিত। এই কবরগুলির আকৃতি হত লম্বা মাটির স্তূপের মত।

আর্যেরা বলদের সাহায্যে ভূমি কর্ষণ করত। উৎপন্ন শস্যের মধ্যে গমই ছিল প্রধান। কিন্তু জমি চাষ করলেও তারা বরাবর এক জায়গায় বাস করত না; শস্য কাটা হয়ে গেলেই অন্য স্থানে চলে যেত। গোড়া থেকেই ব্রোঞ্জ ছিল তাদের জানা ধাতু। পরে—খৃষ্টের জন্মের প্রায় ১৫০০ বছর আগেই তারা লোহার জিনিষ তৈরী করতে শেখে। আর্যদের সামাজিক জীবনের সোনার কাঠিটি কিন্তু মন্দিরের মধ্যে থাকত না। এ বিষয়ে পশ্চিম এসিয়ার সভ্য জাতিগুলির সঙ্গে তাদের ছিল মস্ত প্রভেদ।

প্রাচীন মৃন্ময় স্ত্রীমূর্তি

নেতারা প্রায়ই পুরোহিত বা ধর্মযাজক হতেন না, হতেন বাহুবল-সম্পন্ন ব্যক্তি। অতি প্রাচীন কাল হতে কতগুলি বিশেষ পরিবারকেই নেতৃস্থানীয় মনে করা হত। এই সব পরিবারের পুরুষেরা পেতেন রাজসম্মান।

আর্যেরা ছিল খুব আমুদে লোক। যাযাবর জীবনের ফাঁকে ফাঁকে খাওয়া দাওয়া আর হৈচৈ করতে তারা ছাড়ত না। উৎসবের সময় পানোন্মত্ততা প্রায়ই দেখা যেত। আর প্রত্যেক উৎসবেই কথকেরা গান ও আবৃত্তি করত।

সভ্যতার সংস্পর্শে না আসা পর্যন্ত লিখতে তারা শেখেনি; তবে মুখে মুখে কথক ও চারণদের গান ও আবৃত্তি এত ছড়িয়ে পড়েছিল যে এক জীবন্ত সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল বললেও চলে। আর্যদের প্রত্যেক শাখারই ছিল পুরাণ, গল্প প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নিজেদের ইতিহাস। দেশভেদে সেগুলিকে বলা হত এপিক্, বেদ প্রভৃতি।

আর্যদের সামাজিক জীবন তাদের দলপতির সংসার ও গৃহের সঙ্গে সুগভীর ভাবে জড়িত ছিল। দলপতি যে প্রশস্ত গৃহে বাস করতেন সাধারণতঃ তা হত কাঠ দিয়ে তৈরী। আশে পাশে গো-মেষ প্রভৃতি রাখবার জন্য থাকত গোয়াল ঘর এবং শস্য রক্ষার জন্য থাকত গোলাবাড়ি। এই প্রশস্ত গৃহে কখনও হত সভা, কখনও বা গান-বাজনা। নানা আলাপ-আলোচনা, পাশাখেলা প্রভৃতি এর মধ্যেই চলত। গৃহমধ্যের উচ্চ বেদীতে দলপতি ও তার স্ত্রী শয়ন করতেন। অন্যেরা যে যেখানে পারত রাত কাটাত। ক্রমে বংশবৃদ্ধি হতে আরম্ভ করলে যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় দু হাজার বছর আগে তারা অন্যান্য দেশ আক্রমণ করতে আরম্ভ করে।

আর্যজাতির একটি শাখা খৃষ্টের জন্মের প্রায় এক হাজার বছর আগে হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম গিরিসঙ্কটগুলি দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। সংস্কৃত ছিল তাদের ভাষা। পশ্চিম-এসিয়ার এসিরীয় এবং ব্যাবিলনীয় জাতিরা ইতি-পূর্বেই উত্তরপূর্ব কোন থেকে মিড্, পারসীক্ প্রভৃতি নতুন

আর্যজাতিগুলির লুব্ধ দৃষ্টি দেখে সঙ্কিত বোধ করছিল। বলকান উপদ্বীপের মধ্য দিয়ে আর্যজাতির আর এক শাখা প্রাচীন সভ্যতার অন্য এক লীলাভূমিতে প্রবেশ করে। এরা হচ্ছে গ্রীক এবং ফ্রিজিয়ান্। খৃষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দে তারা প্রসিদ্ধ ইজিয়ান নগর মাইসিনিকে ধ্বংস করে ফেলে।

রথ, মাইসিনি

আর্যদের আর একটি শাখা ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং স্পেনে এসে ঢোকে। দুটি দলে বিভক্ত হয়ে তারা পশ্চিম দিকে ঠেলা দেয়। প্রথম দলে যারা ব্রিটেনে আসে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ছিল ব্রোঞ্জের। এর আগে যে সব আদিম অধিবাসীরা ব্রিটেনের নানাস্থানে পাথরের সুদৃশ্য মন্দিরাদি নির্মাণ করেছিল তারা নবাগত আর্যদের আনুগত্য স্বীকার করল। আয়ার্ল্যাণ্ডেও তারা ঢুকেছিল; সেখানে তাদের নাম হয়েছিল কেল্ট।

প্রাচীন মৃন্ময় স্ত্রীমূর্তি

দ্বিতীয় দলটি ব্রিটেনে প্রবেশ করবার সময় সঙ্গে লোহার তৈরী অস্ত্রশস্ত্রাদি নিয়ে আসে। এদের বলা হত ব্রিটন বা ব্রিটেনিক কেল্ট। কেল্টদের অন্য একটি শাখা স্পেনে হানা দেয় এবং সেখানকার অধিবাসী বাস্কদের সংস্পর্শে আসে। তা ছাড়া সমুদ্রতীরবর্তী ফিনিশীয় উপনিবেশগুলির সঙ্গে আর্যদের যে কোন রকম পরিচয় হয়নি সে কথাও জোর করে বলা যায় না।

কেল্টদের অন্য এক জাতি ইটালীয়ানরা আবার ইটালীর জঙ্গলময় প্রদেশে বাস করতে সুরু করেছিল। কিন্তু তারা বিজেতার মত ইটালীতে প্রবেশ করেনি। যীশুখৃষ্টের জন্মের ৮০০ বছর আগে ইতিহাসে আমরা রোমের নাম প্রথম দেখতে পাই। রোম তখন টাইবার নদীর উপর ছোট একটি বাণিজ্য প্রধান নগর ছিল। ল্যাটিন নামক আর্যজাতির সে সহরে বাস ছিল বটে, কিন্তু শাসনভার তাদের হাতে ছিল না, ছিল এট্রুসকানদের কাছে।

খৃষ্টপূর্ব নবম শতাব্দী থেকে ৬০০ বছরের ইতিহাস হচ্ছে আর্যদেরই ইতিহাস। কী করে তারা বড় হল, কী করে তারা সেমিটিক, ইজিয়ান এবং মিশরের প্রাচীন সভ্যতাকে করতলগত করল এ যুগের ইতিহাসের তাই হচ্ছে আসল কথা। বাইরে থেকে দেখতে গেলে মনে হয় আর্যেরা ছিল সব বিষয়েই বিজয়ী। কিন্তু আর্য, সেমিটিক এবং মিশরীয় সভ্যতার যে দ্বন্দ্ব, কর্তৃত্ব আর্যদের হাতে চলে আসবার ঢের পরেও তা চলতে থাকে। চিন্তা ও ভাবধারার এই প্রভেদ বহুদিন ধরে চলে এসেছে এবং আজও চলছে।

প্রাচীন ভারত

মহেনজোদারোতে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার উল্লেখ করা হয়েছে। এই সভ্যতার সঙ্গে ভারতের অন্য অংশের কতটা এবং কী রকম যোগাযোগ ছিল তা আমরা জানি না। ভারতে পরে যে আর্য-সভ্যতা গড়ে ওঠে তা যে ঐ পুরাতন সভ্যতা থেকে উদ্ভূত নয় সে কথা বিশ্বাস করবার কারণ আছে। অনেকে বলেন মহেঞ্জোদারোর সভ্যতার সঙ্গে ভারতের আদিম দ্রাবিড় সভ্যতার অনেকটা মিল দেখা যায়।

অতি প্রাচীন মাটির তৈরী বৃষ জাতীয় জীবের মূর্তি

আর্যেরা যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসেন তখন তাঁদের জীবন যাত্রা প্রণালী কী রকম ছিল তা আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি। কিছুদিন এখানে থাকবার পর তাঁদের মধ্যে অনেক নতুন প্রথা ও নিয়মের সৃষ্টি হয়। জাতিভেদ প্রভৃতি সমাজ ব্যবস্থা অনেক পরে গড়ে ওঠে। ভারতীয় আর্য সভ্যতাকে মোটামুটি দু ভাগে ভাগ করা চলে। পূর্বভাগে আর্যদের জীবন ছিল খুবই সরল ও সহজ। এ সময় তাঁরা প্রকৃতির নানা বিকাশকে দেবতাজ্ঞানে পূজো করতেন। বেদের কর্মকাণ্ডের প্রয়োগ তাঁদের জীবনে তখনও ঘটেনি।

দ্বিতীয় ভাগে আর্যদের জীবন হয়ে ওঠে অনেক জটিল। এ সময় তাঁদের জীবনের উপর শুধু বেদ নয় পুরানের আধিপত্যও আমরা লক্ষ্য করে থাকি। তা ছাড়া হিন্দুদের ছুটি প্রধান মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত খুব সম্ভবত এ সময়ই রচিত হয়।

আর্যেরা ভারতে প্রবেশ করবার পর দেখলেন যে কতগুলি কৃষ্ণকায় লোক তাদের নিজেদের মধ্যে স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়ে তুলেছে। আর্যেরা এ জাতির নাম দেন অনার্য জাতি। আমরা ধরে নিতে পারি যে এই অনার্য জাতিই হচ্ছে দ্রাবিড় জাতি। এ জাতির সভ্যতা শুধু যে আর্য সভ্যতার চেয়ে পুরানো ছিল তা নয়, অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ ছিল। তবে সামরিক কৌশলে দ্রাবিড়েরা আর্যদের মত তৎপর ছিল না। সুতরাং আর্যেরা ক্রমেই তাঁদের ঠেলে সরিয়ে দিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত দ্রাবিড় সভ্যতা ভারতের দাক্ষিণাত্যেই কেন্দ্রীভূত হল।

আর্যদের মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট দল ছিল; তারা ভারতের নানা অংশে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। খৃষ্টপুর্ব সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে ভারতে যে সব ঘটনা ঘটেছিল তার ঐতিহাসিক মালমসলা আমরা বিশেষ কিছু পাই না। কিন্তু এ সময় থেকে ভারতের একটা মোটামুটি ইতিহাস দাঁড় করান যেতে পারে। খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে আমরা ভারতীয় সভ্যতার যে ছবি পাই তাতে মনে হয় সে সময়ই

এ সভ্যতা খানিকটা প্রাচীন হয়ে গেছে। উজ্জয়িনী, বারানসী, মালব, মগধ, কোশল, শ্রাবস্তী প্রভৃতি তখনই বেশ প্রসিদ্ধ স্থান। মগধের কথাই আমাদের সব চেয়ে বেশী করে মনে পড়ে; কেন না এখানে আমরা পাই সে যুগের কয়েক জন পরাক্রান্ত নৃপতিকে। শিশুনাগ-বংশের রাজা বিম্বিসার সম্ভবত খৃষ্টের জন্মের সাড়ে ছ'শ বছর পূর্বে মগধে রাজত্ব করতেন। বিম্বিসারের পর নাম-করা রাজা হচ্ছেন তাঁর পুত্র অজাতশত্রু। ইতিমধ্যে লিচ্ছবি নামে আর্যদের এক শাখা ভারতে খুব প্রধান হয়ে ওঠে এবং নিজেদের মধ্যে সাধারণতন্ত্র জাতীয় শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে।

ভারতে এ সময় এক ধর্ম বিপ্লবও আরম্ভ হয়। দুটি নতুন ধর্ম ভারতবাসীদের মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে। যাঁরা এই নব ধর্ম দুটির প্রচার আরম্ভ করেন তাঁদের মধ্যে একজনের নাম মহাবীর, অন্যজনের নাম গৌতম বুদ্ধ। মহাবীর ছিলেন লিচ্ছবিবংশসম্ভূত। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের নাম জৈনধর্ম। জৈনধর্ম ভারতকে শিক্ষা দিল যে শুধু তুচ্ছ প্রাণী নয়, তথাকথিত প্রাণহীন বস্তু, যেমন, পাথর, জল, আগুন, বায়ু এদেরও প্রাণ আছে; সুতরাং মানুষের সব চেয়ে বড় কর্তব্য হচ্ছে সকল প্রাণী এবং সকল বস্তুর প্রতি অহিংসা প্রদর্শন। সম্ভবত জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মের চেয়ে পুরাণো। কিন্তু এ ধর্ম কোন কালেই ভারতে বৌদ্ধধর্মের মত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি। বৌদ্ধ ধর্মের স্রষ্টা গৌতম বুদ্ধ ছিলেন প্রথম জীবনে এক

রাজপুত্র। মানুষের রোগ-শোক-জরা এবং তজ্জনিত দুঃখকষ্ট দেখে ইনি সংসারে বীতরাগ হন এবং কী করে এ দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত হওয়া যেতে পারে তা নিয়ে বহু চিন্তা করেন। বহুদিন নানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়ে এবং বহুকাল তপস্যা করে তিনি অবশেষে এক নতুন আলো দেখতে পেলেন। তিনি প্রচার করলেন যে জীবনে রোগ, শোক ও জরা অবশ্যম্ভাবী; এগুলি আসে অবিদ্যা বা অজ্ঞান তিমির থেকে। এগুলি থেকে মুক্তি পেতে হলে পুনর্জন্ম এড়াতে হবে এবং একমাত্র নির্বান লাভ হলেই পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অজ্ঞানতা থেকে উদ্ভূত সমস্ত রকম পাপ জয় করে চরম ও পরম শান্তিলাভের নামই হচ্ছে নির্বাণ। কায়মনোবাক্যে সত্য বলা ও করাই হচ্ছে নির্বাণ লাভের একমাত্র উপায়।

গৌতম বুদ্ধ

এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন। বৌদ্ধধম ও জৈনধর্ম—কোন ধর্মই প্রচলিত বৈদিক ধর্মকে অস্বীকার করে নি; অনেকস্থলে বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যেই আমরা বৈদিক দেবদেবীর নাম শুনতে পাই। তবে বৌদ্ধধর্মকে অবলম্বন করে ভারতে যে এক নতুন চিন্তাধারা গড়ে উঠেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর প্রায় দুশ বছর পর খৃষ্টপূর্ব ৩২৭

অব্দে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন। ভারতে তাঁর কার্যকলাপের কথা যথাস্থানে বলা হবে। আলেকজাণ্ডার ভারতের খানিকটা অংশ জয় করেছিলেন বটে, কিন্তু এদেশে কোন স্থায়ী আধিপত্য রেখে যেতে পারেন নি তাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত তাঁর সেনাপতি সেলুকসকে হারিয়ে দিয়ে বিদেশীর হাত থেকে ভারতের পুনরুদ্ধার সাধন করেন। এ পর্যন্ত আমরা যে কজন ভারতীয় নৃপতির নাম শুনলুম চন্দ্রগুপ্ত তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন বটে, তবে তাঁর রাজত্বে প্রজাদের নানা বিষয়ে উন্নতিও হয়েছিল। তাঁর নিজের হাতে গড়া সৈন্যবাহিনী সেকালে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ সৈন্যবাহিনীতে পরিণত হয়। প্রধান মন্ত্রী কৌটিল্যের সাহায্যে তাঁর রাজত্বের কুটনীতি অতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হত। তাঁর রাজ্যে লোক সংখ্যা গণনার প্রথা প্রচলিত ছিল; বৈজ্ঞানিক উপায়ে কর আদায় করা হত; জল নিকাশের সুন্দর বন্দোবস্ত ছিল; গুপ্তচর বিভাগ ছিল খুবই উন্নত। এক কথায় বর্তমানে সুশাসনের জন্য যে সব বন্দোবস্ত দেখতে পাওয়া যায় তার অনেকগুলি তাঁর সাম্রাজ্যে আমরা দেখি। কাবুল থেকে সমস্ত উত্তর ভারত তাঁর অধিকারে ছিল। গঙ্গার উপর অবস্থিত তাঁর রাজধানী পাটলীপুত্রের নানা জাঁকজমক ও সেখানকার কাঠের তৈরী অতি সুন্দর কারুকার্যসম্পন্ন রাজ-প্রাসাদের অনেক গল্প শুনতে পাওয়া যায়। এ যুগে রচিত কৌটিল্যের

অর্থশাস্ত্র রাজনীতিশাস্ত্রে ভারতের শ্রেষ্ঠ দান বললে অত্যুক্তি হবে না।

চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক খৃষ্টপূর্ব ২৭৩ অব্দে উত্তর ভারতের সিংহাসনে বসেন। ইনি ছিলেন সত্যিকারের রাজর্ষি। ইউরোপে একমাত্র সার্লেমেন ছাড়া কারুর সঙ্গে তাঁকে তুলনা করাই চলে না। রাজা হয়েই তিনি প্রথম যে যুদ্ধ করলেন তাতে যুদ্ধের কুফল তিনি সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। যুদ্ধ জয়ের বাসনা সম্পূর্ণ ত্যাগ করে কিসে তাঁর প্রজাদের সর্বাঙ্গীন কুশল হবে এখন থেকে এই হল তাঁর এক মাত্র চেষ্টা। ক্রমে ইনি বৌদ্ধ ধর্মের ভক্ত হয়ে পড়েন। জনসাধারণ যাতে সৎপথে থেকে জীবন যাপন করতে পারে সে জন্য তিনি ভারতের নানাস্থানে প্রস্তর-স্তম্ভ নির্মাণ করে তার গায়ে নানা উপদেশ খোদিত করেন। এই সব প্রস্তর স্তম্ভগুলির মধ্যে কয়েকটি আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রজাদের জন্য রাজকোষ থেকে অকাতরে অর্থদান করা তাঁর স্বভাবের ছিল আর একটি বিশেষত্ব। তিনি তাঁর ভাই এবং কন্যাকে সিংহলে ধর্মপ্রচার করতে পাঠান। তাঁর দূত ধর্ম ও সদিচ্ছার বাণী নিয়ে পারস্য, মিশর ও গ্রীস পর্যন্ত গিয়েছিল।

নারী, অজন্তা

অশোকের পর বিরাট মৌর্য সাম্রাজ্য কিন্তু ক্রমেই ভেঙে পড়তে থাকে। মৌর্য সাম্রাজ্য চলে যাবার কয়েক শত বছর

পর আমরা ভারতে আর একটি প্রসিদ্ধ রাজবংশের আগমন দেখি। এটি হচ্ছে গুপ্তবংশ। গুপ্ত সাম্রাজ্যে ভারতের লুপ্ত-বিদ্যাগুলির পুনরুন্মেষ ঘটে। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে আমরা এই সাম্রাজ্যের চরম সমৃদ্ধি দেখতে পাই। গুপ্ত-যুগ হচ্ছে ভারতের সুবর্ণ যুগ। শিল্পকলার অভূতপূর্ব উন্নতি এ সময়ে ঘটেছিল। অজন্তা গুহার চিত্র-গুলি এ সময়ে আঁকা হয়েছিল বলেই পণ্ডিতদের ধারণা। অঙ্ক ও জ্যোতি-র্বিদ্যারও এ যুগে অনেক উন্নতি ঘটে। সংস্কৃত ভাষার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কাব্য ও নাটক এ যুগে লেখা হয়েছিল। কবি কালিদাস এই যুগেই তাঁর অমর লেখনী পরিচালনা করেছিলেন। এই সময়ের আর একটি বিশেষত্ব ছিল এই যে বৌদ্ধধর্মের স্থান পুনরায় ব্রহ্মণ্য ধর্ম দখল করে নিতে থাকে। গুপ্ত সম্রাটেরা সকলেই ছিলেন ব্রহ্মণ্যধর্মের অনুরাগী। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ফা হিয়েন গুপ্ত-যুগেই ভারত পরিভ্রমণ করেন। গুপ্ত সম্রাটদের মধ্যে আমরা সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের নাম বিশেষ করে করতে পারি। এই বিরাট ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রচণ্ড হুণ আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে ধ্বংস হয়ে যায়।

প্রাচীন বিষ্ণু মূর্ত্তি

এর পর ভারতের ইতিহাসে এক অন্ধকারের যুগ চলতে চলতে থাকে। ভারতের শেষ প্রসিদ্ধ হিন্দু সম্রাট ছিলেন হর্ষবর্দ্ধন। উত্তর ভারতের ছোট্ট একটি রাজ্যের অধীশ্বর থেকে তিনি ক্রমে উত্তর ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সমরকুশলী এবং ধর্মানুরাগী দুইই। শেষ জীবনে অশোকের মত তিনিও বৌদ্ধ ধর্মের ভক্ত হন। প্রয়াগে যে
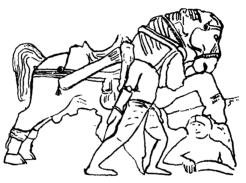
প্রস্তর নির্মিত অশ্ব, কোনারক

প্রসিদ্ধ ধর্মসভায় তিনি অজস্র দান করতেন ভারতের ইতিহাসে তা প্রসিদ্ধ। চৈনিক পর্যটক হিউ এন সাঙ এঁর সভা অলঙ্কৃত করে ভারতে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। হর্ষবর্দ্ধন নিজে একজন সুলেখক ছিলেন এবং প্রজাদের নানা উন্নতির দিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। তাঁর রাজধানী ছিল কনৌজে।

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর কয়েকজন অখ্যাতনামা হিন্দু নৃপতি ভারতের নানা স্থানে রাজত্ব করেন। তারপর উত্তর ভারতের আধিপত্য চলে যায় মুসলমানদের হাতে।

প্রাচীন চীন

চৈনিক সভ্যতা কত প্রাচীন তা নির্ণয় করা খুবই শক্ত। পণ্ডিতেরা বলেন যে নব প্রস্তর যুগের গোড়াতেই সে দেশের লোকেরা কৃষিকার্য শিখে ফেলেছিল। তবে এর পরের বহু-দিনের ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। চীনের সত্যিকারের ইতিহাস চৌবংশের সঙ্গে আরম্ভ হয়। এই রাজবংশ খৃষ্টপূর্ব ১২২২ থেকে ২৪৯ অব্দ—অর্থাৎ ন'শ বছর একটানা রাজত্ব করে যান। চৌসাম্রাজ্যে চৈনিক সভ্যতা নানা দিকে প্রসার লাভ করে। ব্রোঞ্জ দিয়ে সুন্দর সুন্দর পাত্রাদি তৈরী আরম্ভ হয়; চীনে ভাষায় কবিতা এবং ইতিহাস লেখাও সুরু হতে থাকে। চৌসাম্রাজ্যের মধ্যে মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং তিব্বত ছিল না।

খৃষ্টপূর্ব ৬০৪ অব্দে চীনদেশে এমন একজন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করলেন যিনি পরবর্তী চীন সভ্যতাকে নানাভাবে অনু-প্রাণিত করেন। এঁর নাম লাও সি। এঁকে চীনের গৌতম বুদ্ধ বলাও চলে। অবশ্য ইনি বুদ্ধের আগেই জন্মেছিলেন। ভারতে বৌদ্ধধর্ম মানুষকে যা শিখিয়েছে, গ্রীসে স্টোয়িকেরা যে মত প্রচার করত, চীনে লাও সির বক্তব্যের বিষয় ছিল অনেকটা সেই রকম। বাসনা জয় না করলে শান্তি লাভ করা

যায় না এই ছিল তাঁর শিক্ষার মূলকথা। মৃত্যুর পর লাওসিকে দেবতাজ্ঞানে পূজো করা হত।

চীন দেশকে পরবর্তী যুগে আর একজন মণীষী আরও গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁর নাম কনফুসিয়াস। তিনি জন্মেছিলেন খৃষ্টপূর্ব ৫৫০ অব্দে। তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। সুকুমার ও সামরিক শিল্পের চর্চা করতে তিনি খুব ভালবাসতেন। চৈনিক সভ্যতার আইন কানুন কী ভাবে রক্ষা করে চলতে হবে সে সম্বন্ধে তিনি তাঁর দেশের লোককে যে সকল উপদেশ

কনফুসিয়াস

দিয়ে গিয়েছিলেন আজও তারা সেগুলি মেনে চলে। চীন দেশের আচার ব্যবহার ও চীন সভ্যতার আদব কায়দা সম্বন্ধে এঁর চেয়ে বড় কথা এখন পর্যন্ত কেউ বলতে পারেন নি। কনফুসিয়াসের কয়েকটি কথা প্রবাদ বাক্যের মত সারা পৃথিবীতে আজও চলছে। গবর্ণমেণ্ট কিরূপে ভালভাবে চলতে পারে সে সম্বন্ধেও তিনি অনেক কিছু বলে গিয়েছেন। সানটুং প্রদেশের শাসনকর্তা হিসেবে তাঁর উপদেশগুলি তিনি কাযে লাগান; ফলে সমস্ত চীনের অধিবাসীরা তাঁকে পিতার মত ভালবাসতে শেখে। কন্‌ফুসিয়াসের লেখা বুকিং চীন সভ্যতার বিশ্বকোষ। এ থেকে রস গ্রহণ করেন নি চীন দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে এমন কেউ নেই।

খৃষ্টের জন্মের প্রায় দু'শ বছর আগে থেকে রেশম ব্যবসা

মধ্য দিয়ে চীনের সঙ্গে ভারত ও পশ্চিম এসিয়ার সভ্যতার আদান প্রদান হত। রেশম ব্যবসায়ীরা শুধু ব্যবসার জন্যই অন্যান্য দেশে আসত না; তাদের কাছ থেকে এসিয়ার অপর দেশের লোকেরা অনেক নতুন কিছু শিখেওছিল। সিরিয়া চীনের রেশম রোমের কাছে বিক্রী করত। তার ফলে রোমের সঙ্গে চীনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না হলেও দুদেশ দুদেশের মহত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু জানত।

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্মের প্লাবন এসে চীনকে ভাসিয়ে দিল। চীনের মধ্য দিয়ে এ ধর্ম কোরিয়া এবং জাপানেও প্রচারিত হল। মূলত এক হলেও ভারতের বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে চীনের বৌদ্ধ ধর্মের খানিকটা প্রভেদ ছিল। চীন এ ধর্মের মধ্যে তার নিজের ভাবধারা খানিকটা ঢুকিয়ে দেয়। তার ফলে চীনের বৌদ্ধধর্ম চৈনিক সংস্কৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত। নানা রকম শিল্পকলায় চীনের প্রথম বৌদ্ধযুগ গৌরবান্বিত। সুন্দর প্যাগোডা, চিত্রিত পাত্র, বুদ্ধের মর্মর মূর্তি, পাথরের কারুকার্য প্রভৃতি সেকালের চীন সভ্যতাকে জগৎ-প্রসিদ্ধ করেছিল।

চিত্রিত পাত্র

ক্রমে চীনদেশে সামন্ততন্ত্র গড়ে উঠ্‌তে থাকে এবং তার ফলে চৌসাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। খৃষ্টপূর্ব ২৪৯ অব্দে চীনের শাসন-দণ্ড চৌবংশের হাত থেকে চলে গেল। খৃষ্টপূর্ব ২২১ অব্দে একজন সামন্তরাজ অন্যদের পরাজিত করে চীন

সম্রাটের পদ অধিকার করেন। ইনিই প্রসিদ্ধ পি হুয়াঙ-দি। এঁকে চীনের চন্দ্রগুপ্ত বলা চলতে পারে। নিজের বাহুবলে চীন সাম্রাজ্য ইনি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। সামন্ত-তন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ইনি নিজের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক প্রদেশে শাসন-কর্তা নিযুক্ত করেন এবং প্রদেশগুলির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করবার জন্য দীর্ঘ রাজপথগুলি তিনিই প্রথমে নির্মাণ করেন। বহিঃশত্রুর হাত থেকে চীন রক্ষা করবার জন্য ইনি যে দেওয়াল তৈরী আরম্ভ করেছিলেন পরে মিং রাজবংশের দ্বারা পুনর্গঠিত হয়ে সে প্রাচীর পৃথিবীর একটি আশ্চর্যতম বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

পি হুয়াঙ্-দি দক্ষ নৃপতি হলেও জনপ্রিয় হতে পারেন নি। কনফুসিয়াসের শিক্ষার সঙ্গে তাঁর বিরোধ এর একটি প্রধান কারণ। একবার তিনি কনফুসিয়াসের কয়েকখানি বই আগুনে পুড়িয়ে ফেলবার আদেশও দিয়েছিলেন।

পি হুয়াঙ-দির মৃত্যুর পর খৃষ্টপূর্ব ২০৬ অব্দে চীনের কর্তৃত্ব হান রাজবংশের হাতে চলে যায়। এই বংশ চারশ বছর চীনে আধিপত্য করেছিলেন। চীন-সংস্কৃতির পুনরুন্মেষ, চীন সাম্রাজ্যের প্রসার ও সর্বাঙ্গীন চৈনিক সমৃদ্ধির জন্য হান যুগ চীনের সুবর্ণযুগ বলে খ্যাত। এই বংশের রাজত্বকালে চীনে এক সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা নিয়ে রাজকর্মচারী নিয়োগও এ সময় চলত। হান [illegible] মধ্যে সব চেয়ে প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন বু-তি।

২২০ খৃষ্টাব্দে হান রাজবংশের অবসান হয়। তারপর চীনে আরম্ভ হয় এক অন্ধকারের যুগ। এ সময় কতকগুলি বর্বর জাতি এই বিরাট দেশ আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করতে থাকে। তবে এ দুর্দিনেও চীন সভ্যতার একেবারে অধোগতি ঘটেনি। কোরিয়া ও জাপানে চীন সংস্কৃতির প্রসার চলেছিল। শুনলে আশ্চর্য না হয়ে থাকা যায় না যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চীনের নাবিকেরা চুম্বকের সাহায্য নিয়ে সমুদ্র যাত্রা করত।

প্রাচীন ডিজাইন

৬১৮—৯০৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীনে টাং রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এ যুগ চীনের ইতিহাসে আর একটি স্বুবর্ণ যুগ; হৃত-রাজ্যের পুনরুদ্ধার ও সাম্রাজ্যের প্রসার এ যুগের একটি বিশেষত্ব। পারস্য, কনষ্টানটিনোপল এবং মহম্মদের দূতেরা এ বংশের রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। এ বংশের রাজত্ব-কালে আরব সওদাগরেরা চীনের রেশম কিনতে মধ্য এসিয়ায় আসত। সাহিত্য, চিত্রবিদ্যা এবং ভাস্কর্যের অনেক উন্নতি এ সময় চীনে হয়।

খৃষ্টের জন্মের আগে থেকেই কাঠের ব্লকের সাহায্যে চীনে মধ্যে মধ্যে ছাপার কায চালান হত। তবে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে এ দেশে ভাল করে বই ছাপা আরম্ভ হয়। মুদ্রণকৌশল পৃথিবীকে চীনের শ্রেষ্ঠ দান। চীনের কাছ থেকে ইউরোপ বহুদিন পর—খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে এ কৌশল আয়ত্ত করে।

ইহুদীদের ইতিহাস

খৃষ্টের জন্মের এক হাজার বছর আগে পর্যন্ত ইহুদীরা জুডিয়াতে বাস করত। পরে তাদের রাজধানী সরিয়ে আনা হয় জেরুজেলেমে। চারিদিকে যে সব রাজ্যের উত্থান পতন ঘটছিল তার সঙ্গে তাদের নিজেদের ইতিহাস গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল।

হিব্রু নেতা আব্রাহাম সম্ভবত ব্যাবিলনরাজ হাম্মুরাবির সমসাময়িক ছিলেন। বাইবেলের "জেনিসিস"নামক খণ্ডে তাঁর ভ্রমণকাহিনী এবং দুর্ভাগ্যের অনেক কথা জানা যায়। আব্রাহাম যখন কেনান্ দেশের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করছিলেন তখন নাকি ভগবান তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে সেই সুরম্য অট্টালিকাশোভিত দেশ তিনি ও তাঁর সন্তানসন্ততিরাই ভোগ করবেন।

দীর্ঘকাল মিশরে ঘুরে বেড়িয়ে এবং মোজেসের নেতৃত্বে পঞ্চাশ বৎসরকাল নানা দুর্গম প্রদেশে অতিবাহিত করে আব্রাহামের বংশধরেরা ক্রমে বারটি দলে ভাগ হয়ে যায়। খৃষ্টপূর্ব ১৬০০ থেকে ১৩০০ বৎসরের মধ্যে তারাই আরবের মরুভূমি থেকে কেনান্ আক্রমণ করে। কিন্তু ভগবানের প্রতিশ্রুত দেশের সামান্য কিছু পার্বত্যভূমি ছাড়া তারা অন্য

কোন অংশ জয় করতে পারল না। এ সময় সমুদ্রের তীরবর্তী প্রদেশ কেনানবাসীদের অধীনে ছিল না, ছিল ইজিয়ান এবং ফিলিস্টাইনদের আয়ত্তে। গাজা, এশডড্, এসকেলন্, জোপ্পা প্রভৃতি নগরগুলি কৃতিত্বের সঙ্গে হিব্রু আক্রমণ প্রতিরোধ করে। সুতরাং বহু শতাব্দী ধরে আব্রাহামের বংশধরেরা বিজিত পার্বত্যভূমিতে বিদেশীর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। এ সময়ে তাদের কার্য ছিল ক্রমাগত ফিলিস্টাইন, মোআবাইট, মিডিয়ানাইট প্রভৃতি জাতিগুলির সঙ্গে কলহ ও যুদ্ধ করা। এই সময় তারা যে সব যুদ্ধ করেছিল তার বিবরণ এবং সল্, ডেভিড, সলোমন ও হিব্রু পুরোহিতদের অনেক গল্প আমরা বাইবেলের পূর্ব খণ্ডে পাই।

পারসীকদের কাছে এসিরীয় এবং ব্যাবিলনীয় জাতিদ্বয়ের পরাজয় সেমিটিকদের সর্বনাশের সূচনা মাত্র। এ পরাজয় সত্ত্বেও খৃষ্টের জন্মের ৮০০ বছর আগে কেউ কল্পনা করতে পারে নি যে আর ৪০০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর বুক থেকে সেমিটিক আধিপত্য একেবারে মুছে যাবে, আর সে স্থান গ্রহণ করবে আর্যভাষাভাষী বিজেতারা।

যীশুখৃষ্টের জন্মের আগের পাঁচটি শতাব্দী ইতিহাসের দিক থেকে খুবই মূল্যবান। এই সময় যে সব সেমিটিক জাতি আর্যদের কাছে পরাভূত হয় তাদের মধ্যে ইহুদিরা আশ্চর্য একতার সঙ্গে নিজেদের পুরাতন আচার ব্যবহার এবং ঐতিহ্য

রক্ষা করে চলেছিল। এ সময় হিব্রু প্রচারকেরা এমন এক নতুন শক্তির সন্ধান পান যা ভবিষ্যৎ মানব সমাজকে সম্পূর্ণ নতুন পথ দেখিয়ে দিল। যে বাইবেল পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ নরনারীকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে তা হচ্ছে ইহুদীদেরই দান।

প্রাচীন গ্রীক জাতি

সলোমানের মৃত্যুর পর ইহুদীদের ছোট ছোট রাজ্যগুলি যখন ভেঙে পড়ছিল সে সময় পৃথিবীর অন্যদিকে গ্রীক সভ্যতা আপন প্রভাব বিস্তার করে চলেছিল।

অন্যান্য আর্যদের মত গ্রীকদের মধ্যেও ছিল অনেক গায়ক ও কথক। এদের সাহায্যে অতি প্রাচীনকালের দুটি মহা-কাব্যকে বাঁচিয়ে রাখা হয়। একটির নাম ইলিয়ড্, অন্যটির নাম অডিসি। ইলিয়ডের গল্প হচ্ছে কী করে সম্মিলিত গ্রীক সৈন্য এসিয়া মাইনরের ট্রয় নগর জয় ও ধ্বংস করে ফেলল। আর কী করে বীর অডিসিউস নানা বিপদ আপদের মধ্য দিয়ে অনেক ঘুরে ফিরে ট্রয় থেকে স্বদেশে ফিরে আসেন তাই হচ্ছে অডিসির আসল কথা। বহুকাল থেকে মুখে মুখে মহাকাব্য দুটি প্রচারিত হয়ে আসছিল। বিখ্যাত গ্রীক কবি হোমার নাকি এ দুটির মূল রচয়িতা।

এ দুটি পুস্তক থেকে আমরা জানতে পারি যে প্রথমে গ্রীকেরা ছিল এক বর্বর জাতি। তারা লিখতে জানত না, লোহার ব্যবহার জানত না এবং নাগরিক জীবনেও অভ্যস্ত ছিল না। যে সব ইজিয়ান সহর তারা ধ্বংস করত প্রথম প্রথম সেগুলির ধ্বংসস্তুপের বাইরে তারা গড়ত নিজেদের

ছোট্ট গ্রামগুলো। গ্রামের মাঝখানে হত দলপতির থাকবার প্রশস্ত হলগৃহ। চারপাশে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরে তারা নিজেরা থাকত। পরে নিজেদের সহরের চারপাশে পাঁচীল গেঁথে নগর রক্ষার কৌশল তারা শেখে। যে সব সুসভ্য জাতিকে তারা পরাস্ত করেছিল তাদের কাছ থেকে তারা শিখে নিল মন্দির নির্মাণের কৌশল। আরও পরে তারা আরম্ভ করল ব্যবসা বাণিজ্য। ব্যবসার খাতিরে দূরে দূরে উপনিবেশ স্থাপন করার আবশ্যক হল। খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে গ্রীক উপত্যকায় এবং দ্বীপমালাতে আথেন্স, স্পার্টা, করিনথ, থিবস, সেমোস, মাইলেটাস প্রভৃতি কতগুলি নতুন নগরের পত্তন হয়। তাছাড়া ইটালী, সিসিলি এবং কাস্পিয়ান হ্রদের তীরভূমিতেও গ্রীক উপনিবেশ গড়ে উঠতে থাকে।

সে কালের গ্রীস দেশ ছিল কতগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত। কোন সহরের জনসংখ্যা সম্ভবত তিন লক্ষের বেশী ছিল না। ব্যবসা বাণিজ্য বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এই সব গ্রীক নগর সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকে; ছোট ছোট নগরগুলি নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার আশায় অনেক সময় বড় বড় সহরগুলি সাহায্য নিত।

নানা বিভেদ সত্বেও দুটি কারণে সমস্ত গ্রীস ব্যাপে ছিল একটি একতার ভাব। একটি কারণ হচ্ছে মহাকাব্য-গুলি, আর একটি হচ্ছে অলিম্পিক খেলা। চার বৎসর পর

পর অলিম্পিয়াতে নানা দৈহিক ক্রীড়ার অনুষ্ঠান হত। গ্রীসের রীতি অনুসারে প্রত্যেক রাজ্য এবং প্রত্যেক নগর এই ক্রীড়ায় যোগ দিত। তা সত্ত্বেও নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ তারা করত না ত নয়; তবে এই একতার ভাবের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ হত কম। অলিম্পিয়ার ক্রীড়ায় যারা যোগ দিতে আসত বা যোগদান করে ফিরে যেত তাদের রক্ষা করবার জন্য গ্রীসের সমস্ত রাজ্য এবং নগরগুলির মধ্যে হত এক সন্ধি।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীস দেশে মাইলেটাসের থেলস্ এবং এনাক্সিমেণ্ডার ও এফিসিউসের হেরাক্লিসাস প্রভৃতি কয়েকজন স্বাধীনচেতা জ্ঞানী ব্যক্তির জন্ম হয়। পৃথিবী কোথা থেকে এল, তার স্বরূপ এবং পরিণাম কি—এই সব কঠিন প্রশ্ন নিয়ে এঁরা আলোচনা আরম্ভ করেন। এই গ্রীক তত্ত্ব জিজ্ঞাসুদের বলা যেতে পারে ইউরোপের প্রথম দার্শনিক।

গ্রীস ও পারস্য

গ্রীকেরা যখন এসিয়া মাইনরে, দক্ষিণ ইটালীতে এবং তাদের নিজেদের দেশে তত্ব জিজ্ঞাসায় ব্যস্ত, হিব্রু-প্রচারকেরা যখন মানুষের মনোজগতে এক বিপ্লব আনতে অধীর, সে সময় মিড্ এবং পারসীক এই দুটি আর্যজাতি প্রায় সমস্ত পৃথিবী জয় করে ফেলে একটি একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল। পৃথিবী জুড়ে এত বড় রাজত্ব এর আগে আর কখনও দেখা যায় নি। এই বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন পারস্য সম্রাট প্রথম ডেরিয়াস।

অবশ্য কার্থেজ, সিসিলি ও ইটালীর গ্রীকেরা এবং স্পেনের ফিনিসীয়রা এই পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল না। কিন্তু তারা এই বিরাট রাজ্যকে যথেষ্ট ভয় এবং সমীহ করত।

গ্রীকেরা যে তাঁর অধীনে থাকবে না মহাবীর ডেরিয়াস একথা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। ফিনিসীয় নৌ-বহরের সাহায্য নিয়ে তিনি একটি একটি করে গ্রীসের অনেকগুলো দ্বীপ জয় করেন এবং শেষে আথেন্স নগরের উপর এক ভীষণ আক্রমণ চালান। এসিয়া মাইনর এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগরের বন্দরগুলি থেকে এক বিরাট নৌবহর গ্রীসের দিকে যাত্রা করে এবং আথেন্সের উত্তরে ম্যারাথন নামক

স্থানে পারস্যরাজের সৈন্য নামিয়ে দেয়। আশ্চর্যের বিষয় এই বিরাট সৈন্যবাহিনীকে আথেন্সের লোকেরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে।

এই সময় এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার আমাদের চোখে পড়ে। গ্রীসে আথেন্সের সর্ব প্রধান শত্রু ছিল স্পার্টা। কিন্তু শত্রু হলেও বিপদের সময় আথেন্স স্পার্টার সাহায্য চায়। একজন দূতকে দিয়ে আথেন্সবাসীরা স্পার্টান্‌দের বলে পাঠায় যে পরস্পর শত্রুতা থাকলেও তারা সকলেই গ্রীসের অধিবাসী। বাইরের এই বর্বর শত্রুর হাত থেকে যদি গ্রীসকে বাঁচাতে হয় তাহলে স্পার্টা যেন শত্রু হলেও আথেন্সের সাহায্য করতে দ্বিধা না করে। পত্রবাহক দুদিনের মধ্যে আথেন্স থেকে স্পার্টার দূর্গম ২০০ মাইল পথ অতিক্রম করে যথাসময় সে খবর স্পার্টাবাসীদের কাছে পৌঁছে দিল। স্পার্টানরাও যথাসম্ভব শীঘ্র সাহায্য পাঠাতে কার্পণ্য করেনি। কিন্তু তিন দিন পর স্পার্টার সৈন্যরা যখন আথেন্সে এসে পৌঁছল তখন তারা দেখল তাদের করবার কিছু নেই। আথেন্সবাসীরা নিজেরাই পারসীক সৈন্য মেরে ছারখার করে ফেলেছে; যা অবশিষ্ট ছিল তা নিয়ে পারস্যের নৌবহর এসিয়ায় ফিরে পালাল। এই ভাবে গ্রীসের উপর পারস্যের প্রথম আক্রমণ হল শেষ।

দ্বিতীয় আক্রমণটি হয় আরও ভয়ানক। ম্যারাথনে পারসীক সৈন্যের শোচনীয় পরাজয়ের খবর পাবার কিছুদিনের

মধ্যেই ডেরিয়াসের মৃত্যু হয়। তারপর রাজা হন তাঁর পুত্র জারক্সেস। পিতার আরব্ধ কার্য শেষ করতে তিনি হয়েছিলেন বদ্ধপরিকর। চার বৎসর ধরে এমন একটি সৈন্যবাহিনী তিনি গড়লেন যা তখন পর্যন্ত মানুষ কল্পনায়ও আনতে পারত না। এই বিরাট বাহিনী গ্রীসকে ধ্বংস করতে বীরদর্পে অগ্রসর হল। নৌকোর পুল দিয়ে দার্দানেলিস পার হয়ে তারা সামনের দিকে এগিয়ে চলল, আর পাশে পাশে সমুদ্র দিয়ে তাদের রসদ বহন করে চলল এক নৌবহর। থার্মোপাইলির সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে স্পার্টাবাসী বীর লিওনিডাস মাত্র ১,৪০০ জন সৈন্য নিয়ে এই বাহিনীকে বাধা দেন। গ্রীক সৈন্যদের প্রত্যেকেই মারা পড়লো। কিন্তু যুদ্ধে যে বীরত্ব তারা দেখাল তার তুলনা নেই বললেই চলে। যুদ্ধের ফলে পারসীক সৈন্যেরাও হল ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত। যাই হোক, বিজয়ী পারসীকেরা থিব্‌স ও আথেন্সে ঢুকে পড়ল। থিবস্‌ আত্মসমর্পণ করে সন্ধি করে; আথেন্সবাসীরা তাদের নগর ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায় এবং পারসীক সৈন্যেরা এই পরিত্যক্ত নগরকে দেয় পুড়িয়ে।

সমস্ত গ্রীস যখন এইভাবে পারস্যের পদানত হয় হয় তখন অপ্রত্যাশিত ভাবে তারা বিপদ থেকে মুক্ত হল। গ্রীক নৌবহর পারস্য নৌবাহিনীর তিনভাগের একভাগের চেয়ে ছোট হলেও সালামিস্‌ উপসাগরে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে দেয়। ফলে জারক্সেসের সমস্ত সৈন্য রসদ

এবং যুদ্ধের উপকরণ থেকে বঞ্চিত হল। ব্যাপার দেখে জার্‌কসেস নিজেও গেলেন ঘাবড়ে। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীর অর্ধেক নিয়ে এসিয়ায় পালালেন, বাকী অর্ধেক প্ল্যাটিয়ায় গ্রীকদের কাছে পরাজিত হল। পারস্য নৌবাহিনীর যেটুকু পালিয়ে যাচ্ছিল গ্রীকেরা সেটুকুর অনুসরণ করে এসিয়া মাইনরের কাছে আট্‌কে ফেলে এবং একেবারে নষ্ট করে দেয়।

এতদিনে পারস্য-শক্রর আক্রমণ চিরকালের মত থাম্‌ল। এসিয়ার অধিকাংশ গ্রীক সহরগুলি আবার স্বাধীন হল। গ্রীস এবং পারস্যের মধ্যে এই বিবাদের কথা অতি সুন্দরভাবে হেরোডোটাস্‌ তাঁর রচিত "ইতিহাস" নামক গ্রন্থে বলেছেন।

গ্রীসের সমৃদ্ধি

পারস্যের পরাজয়ের পর ১৫০ বৎসর পর্যন্ত চলে গ্রীক সভ্যতার একটানা সমৃদ্ধি। অবশ্য এ সময় সমগ্র গ্রীসের নেতা কে হবে এই নিয়ে আথেন্স, স্পার্টা এবং অন্যান্য গ্রীক রাজ্যের মধ্যে রেশারেশী চলছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ যুগে গ্রীসের কলা এবং শিল্প এত সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে যে পরের ইতিহাসে সমস্ত মানব জাতিকে তা পথ দেখিয়েছে।

গ্রীক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ছিল আথেন্স নগর। খৃষ্টপূর্ব ৭৬৬ থেকে ৪২৮ অব্দ-এই ত্রিশ বছর আথেন্সের সর্বপ্রধান নাগরিক ছিলেন পেরিক্লিস। পারসীকেরা আথেন্সের যে ধ্বংস সাধন করেছিল তা থেকে তিনিই এই নগরের উদ্ধারের ব্যবস্থা করেছিলেন। আজ আমরা আথেন্সের স্থাপত্যের যে শেষ নিদর্শনটুকু দেখি তা সম্ভব হয়েছিল পেরিক্লিস কর্তৃক আথেন্স পুনর্গঠনের ফলে। কিন্তু পেরিক্লিস তাঁর নগরে শুধু ভাস্কর এবং স্থপতিদের একত্রিত করেই তাঁর কায শেষ করেন নি, নানাস্থান থেকে তিনি কবি, নাট্যকার, দার্শনিক এবং শিক্ষকও সংগ্রহ করেছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ৪৩৮ অব্দে হেরোডোটাস আথেন্সে আসেন পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত ইতিহাস রচনা করতে। তারপর এনাক্সাগোরাস এলেন সূর্য এবং নক্ষত্রের

বিবরণ নিয়ে। তাছাড়া ইস্‌কিলাস্‌, ইউরিপিডিস, সফক্লিস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিরা গ্রীক নাটককে সৌন্দর্য ও সুষমায় করে তুললেন শ্রেষ্ঠ।

পেরিক্লিসের মৃত্যুর পর এলোমেলো চিন্তা পদ্ধতিকে একেবারে ত্যাগ করে কী করে সত্যানুসন্ধান করতে হয় তার পথ দেখিয়েছিলেন সক্রেটিস্‌। তাঁর শিক্ষায় আকৃষ্ট হয়ে কয়েকজন মনস্বী যুবক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনসাধারণের মনের শান্তি নষ্ট করে দেবার অপরাধে সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তাঁকে আদেশ করা হয় যে নিজের বাড়িতে শিষ্য পরিবৃত হয়ে তাঁকে তীব্র বিষপান করতে হবে। তাঁকে মরতে হল বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকের মনের অশান্তি কিছুমাত্র গেল না। সক্রেটিসের বাণী অধিকতর তেজের সঙ্গে প্রচার করতে লাগলেন তাঁর শিষ্যেরা।

ভিনাস-ড-সাইলো
গ্রীকভাস্কর্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন

সক্রেটিসের প্রধান শিষ্য ছিলেন প্লেটো। ইনি খৃষ্টের জন্মের ৪০০ বছর আগে আথেন্সের “একাডেমীতে” দর্শন শিক্ষা দিতেন।

প্লেটোর পর তাঁর প্রিয় শিষ্য এরিস্টটল সত্য চিন্তার পথ কী এবং কোন প্রকার শাসন তন্ত্র গ্রীসের পক্ষে সব চেয়ে ভাল এ দুটি বিষয় সম্বন্ধে যথেষ্ট অনুসন্ধান করেন। এরিস্টটল ছিলেন লাইসিয়ামের শিক্ষক। তিনি প্রথমে আথেন্সে আসেন ম্যাসিডোনিয়া থেকে এখানে তাঁর পিতা ছিলেন রাজ-চিকিৎসক। কিছুদিন ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপের পুত্র আলেকজাণ্ডারের শিক্ষকের কাযও তিনি করেছিলেন।

চিন্তা করবার যথার্থ উপায় সম্বন্ধে এরিস্টটল যে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন বাস্তবিক তা ইওরোপীয় ন্যায়-শাস্ত্রকে অনেক উন্নত করে। এরিস্টটল ন্যায়শাস্ত্রকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলেন ১৫০০ বছর পর্যন্ত তা সেই অবস্থাতেই ছিল; তারপর মধ্যযুগের পণ্ডিতেরা এ সম্বন্ধে আবার নানা আলোচনা করেন। আজ বিজ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি এরিস্টটল হচ্ছেন তার পিতা। তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য তিনি নানা স্থানে তাঁর অনুচর পাঠিয়েছিলেন। তা ছাড়া রাজনীতিতে তাঁর দান যে অসামান্য তাও মেনে নিতে হবে। গ্রীকদের নাগরিক রাজ্যের শাসনতন্ত্র কী প্রকার হলে তাতে জনসাধারণের উপকার হয় তা তিনিই সর্বপ্রথম আলোচনা করেন।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেই গ্রীসে এমন সব ব্যক্তি জন্মেছিলেন যাঁদেরকে অনায়াসে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের দলে ফেলা চলে।

আলেকজাণ্ডার

গ্রীসের উত্তরে তারই জ্ঞাতি-রাজ্য মেসিডোনিয়া ধীরে ধীরে সভ্যতায় ও ক্ষমতায় বেড়ে উঠ্ছিল। খৃষ্টপূর্ব ৩৩৮ অব্দে সে দেশের রাজা ফিলিপস গ্রীস্ দেশ জয় করে ফেলেন।

চার বৎসর পর তাঁর পুত্র জগৎপ্রসিদ্ধ আলেকজাণ্ডার গ্রীস থেকে এশিয়ায় এসে, গ্রেনিসাসের যুদ্ধে পারসীক সৈন্যদের হারিয়ে দেন এবং এসিয়া মাইনরের অনেকগুলি নগর দখল করেন। তিনি সমুদ্রতীর ঘেঁসে অগ্রসর হতে থাকেন। সমুদ্রতীরের অধিকৃত নগরগুলির রক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়েছিল। কারণ, পারসীকেরা হেরে গেলেও টায়ার ও সীডনের নৌঘাটি আগলে বসেছিল। সুতরাং স্থলপথ বন্ধ হলেও সমুদ্র ছিল তাদেরি অধীনে। যাই হোক, খৃষ্টপূর্ব ৩৩৩ অব্দে ইসাসের যুদ্ধে তিনি পারস্য এবং মিডিয়ার এক বিরাট বাহিনীকে হারিয়ে দেন। এই বাহিনীটি আকারে ছিল জার্কসেসের বাহিনীর মত। এর পর অবশ্য টায়ার অধিকার ও ধ্বংস করা খুবই সহজ হয়ে যায়। শুধু টায়ার নয়, আলেকজাণ্ডার গাজা নগরকেও ধ্বংস করেন এবং মিশরে

আলেকজাণ্ডার

প্রবেশ করে পারসীকদের হাত থেকে সে দেশের শাসন ভার নিয়ে নেন। আলেকজানড্রাতা এবং আলেকজানড্রিয়ায় তিনি দুটি সুন্দর নগর নির্মান করেছিলেন।

খৃষ্টপূর্ব ৩৩১ অব্দে আলেকজাণ্ডার মিশর থেকে ব্যাবিলনের উপর আক্রমণ চালাতে আরম্ভ করলেন। বিস্মৃত নগরী নিনেভার ধ্বংসস্তুপেব কাছে আরবেলা নামক স্থানে তাঁর সৈন্যেরা ডেরিয়াসের সেনাবাহিণীর সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করে। ডেরিয়াসকে নিজের পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে আলেকজাণ্ডার সমৃদ্ধিশালী ব্যাবিলনের ভিতর প্রবেশ করেন এবং সেখান থেকে সুসা ও পারসিপোলিস যান। শেষোক্ত স্থানে প্রচুর পান ভোজনের পর তাঁর সৈন্যেরা মহাবীর ডেরিয়াসের প্রাসাদকে ধ্বংস করে ফেলে।

তারপর নিজের শৌর্য্য বীর্য্য দেখাতে অধীর হয়ে আলেকজাণ্ডার পারস্য ভেদ করে প্রায় মধ্য এসিয়া পর্যন্ত চলে যান। প্রথমে তিনি ফেরেন উত্তরে। সম্রাট ডেরিয়াস সে সময় প্রাণভয়ে পালাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত রণোন্মত্ত গ্রীক সৈন্যেরা একদিন ভোর বেলা তাঁকে দেখতে পেয়ে গেল। রথে উপবিষ্ট অবস্থায় ডেরিয়াস তাঁর নিজের সৈন্যদের দ্বারাই নিহত হলেন। গ্রীকেরা যখন এসে পৌঁছাল তখনও তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন নি। আলেকজাণ্ডার এগিয়ে আসছিলেন তাঁর মুমূর্ষু শত্রুকে দেখবার জন্য। কিন্তু দেখা হল না। তাঁর আগমনের আগেই পরাজিত লাঞ্ছিত পারসীক

বীর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে পৃথিবীর সমস্ত অপমানের হাত থেকে নিজেকে বাঁচালেন। আলেকজাণ্ডার এবার কাস্পিয়ান হ্রদ ঘুরে পশ্চিম তুর্কীস্থানের কাছে এসে পৌঁছালেন এবং পাহাড়ের মধ্য দিয়ে হিরাট ও কাবুল পার হয়ে খাইবার গিরিসঙ্কট ভেদ করে ভারতে উপস্থিত হলেন। সিন্ধু নদীর তীরে একজন ভারতীয় রাজার সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধ হয়। এখানেই গ্রীক সৈন্যেরা যুদ্ধে হাতীর ব্যবহার সর্বপ্রথম দেখল। ভারতীয়েরা আলেকজাণ্ডারের কাছে পরাজিত হল। আলেকজাণ্ডার আরও কিছু দিন ভারতে অপেক্ষা করলেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যেরা আর এগুতে রাজী হল না। সিন্ধুতীর থেকে কতগুলি জাহাজ নির্মাণ করিয়ে আলেকজাণ্ডার নদী যোগে বেলুচিস্থানের পাশ দিয়ে ফিরে চললেন। খৃষ্টপূর্ব ৩২৪ অব্দে তিনি আবার ফিরে এলেন সুসা নগরীতে।

যে বিরাট সাম্রাজ্য তিনি এইভাবে গড়লেন তার ভিত্তিকে দৃঢ় করতে এবার তিনি মন দিলেন। নানা উপায়ে নতুন প্রজাদের মন পেতে তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। পারস্য-রাজের পোষাক এবং মুকুট তিনি নিজেই পরতেন। অবশ্য এই বহুমূল্য রাজবেশ তাঁর সেনাপতিদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করে এবং* বহু কষ্টে তিনি তা নিবারণ করেন। পারস্য এবং ব্যাবিলনের বহু মেয়ের সঙ্গে তিনি মেসিডোনীয় সৈনিকদের বিবাহ দিয়েছিলেন। এইভাবে পূবের সঙ্গে পশ্চিমের যোগ-সূত্র স্থাপন করতেও তিনি ইতস্তত করেন নি। কিন্তু এত

চেষ্টা সত্ত্বেও যে সাম্রাজ্য তিনি গড়লেন তাকে সুদৃঢ় রেখে যেতে পারলেন না।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হতে না হতেই তাঁর জগৎজোড়া সাম্রাজ্য তাসের বাড়ির মত ভেঙে পড়ল। তাঁর সেনাপতি প্রথম সেলুকস সিন্ধুনদ থেকে এফিসিউস পর্যন্ত প্রায় সবটাই নিজে নিয়ে নেন এবং তাঁর নিজের নাম অনুসারে নতুন রাজ্যের নামকরণ করেন "সেলুকিড্ সাম্রাজ্য"। ভারতে এ সাম্রাজ্য সেলুকস বেশী দিন রাখতে পারেন নি। মহাপরাক্রান্ত চন্দ্রগুপ্তের কাছে শীঘ্রই তাঁর হার হয়। টলেমী নামে আলেকজাণ্ডারের আর একজন সেনাপতি মিশর অধিকার করে নিলেন এবং অন্য আর একজন সেনাপতি করলেন ম্যাসিডোনিয়া অধিকার। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্যের মৃতদেহের তলা থেকে আর একটি নতুন শক্তির অভ্যুত্থান অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। এই নতুন ক্ষমতা হচ্ছে রোমের সাধারণতন্ত্র। ধীরে ধীরে সে শক্তি আলেকজাণ্ডারের দ্বিধা বিভক্ত সাম্রাজ্যের অংশগুলিকে অধিকার করে নেয় এবং সে স্থানে রচনা করে এক নতুন দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যের।

আলেকজাণ্ডারের অনুচর প্রথম টলেমী আলেকজান্দ্রিয়াতে বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় একটি নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। গ্রীক সরস্বতী মিউজের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল বলে এই প্রতিষ্ঠানটিকে বলা হত মিউজিয়াম। কয়েক যুগ ধরে এ নগরে বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল অনুসন্ধান চলেছিল তা

সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। এ সহরেই ইউক্লিড্ তাঁর জ্যামিতি প্রকাশ করেছিলেন। এখানে দাঁড়িয়েই এরাটোসথিনিস মানুষকে শেখালেন পৃথিবী কত বড়। আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়ামে বসে হিপ্পারকাস সর্বপ্রথম নক্ষত্র জগতের মানচিত্র তৈরী করেন আর হেরো করেন বাষ্পচালিত এঞ্জিন সম্বন্ধে প্রথম গবেষণা। আরকিমিডিস্ নিজে শিক্ষার জন্য সাইরাকিউস থেকে আলেকজান্দ্রিয়াতে আসেন। মিউজিয়ামের সঙ্গে তাঁর সংস্পর্শ ছিল গভীর। আর এখানেই নাকি গ্রীক দেহতত্ত্ববিদ্ হেরোফিলাস্ প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করেন।

এই মিউজিয়াম ছাড়া প্রথম টলেমী আলেকজান্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ লাইব্রেরীরও প্রতিষ্ঠাতা। এখানে শুধু যে বই রাখা হত তা নয়, বই নকল এবং বিক্রী করাও হত। বইএর সংখ্যা বাড়াবার জন্য অনেক নকলনবিশ নিযুক্ত করা হয়েছিল। টলেমীদের রাজত্বকালেই হিব্রু ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের গ্রীকভাষায় অনুবাদ করা হয়। এ সময় গ্রীক পণ্ডিতেরা হোমারের ইলিয়ড্ এবং অডিসির দুটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন।

ইতিহাসের দিক থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী এবং মিউজিয়ামের মূল্য খুব বেশী। আর এগুলির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আলেকজাণ্ডার এবং তাঁর অনুচরেরা যে খুবই প্রশংসার যোগ্য তাতে সন্দেহ নেই। মানুষের মনোজগতে এ যুগে গ্রীকদের আধিপত্য ছিল বলে এ সময়টাকে গ্রীক বা হেলেনিক যুগ বললে খুব ভুল হয় না। গ্রীক সভ্যতা এবং

শিক্ষা স্বদেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে মিশরে এবং পশ্চিম এসিয়াতেও পৌঁছেছিল। সুতরাং গ্রীস এসিয়াকে এবং এসিয়া ও রোমের মধ্যে দিয়ে জগৎকে অনেক কিছু শিখিয়েছিল বললেও অন্যায় হবে না। আলেকজাণ্ডার এসিয়া এবং মিশরে যে সব নগর নির্মাণ করেছিলেন গ্রীকভাষা ধীরে ধীরে সেগুলিতে প্রসার লাভ করে। আর সে জন্যই পৃথিবীর সে যুগের শ্রেষ্ঠভাষা গ্রীকে বাইবেলের উত্তর খণ্ড "নিউ টেষ্টামেণ্ট" রচিত হয়।

খৃষ্টপূর্ব ৩২৩ থেকে ১৪৬ অব্দ—অর্থাৎ আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর সময় থেকে রোমের অভ্যুত্থান পর্যন্ত এই হেলেনিক যুগ চলেছিল। তারপর ধীরে ধীরে ক্রীশ্চানিটির আওতায় গ্রীক সভ্যতা ঢাকা পড়ে যায়।

রোম

পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা রোমের প্রথম সাক্ষাৎ পাই টাইবার নদীর উপর ছোট্ট একটি বাণিজ্যপ্রধান নগর হিসেবে। এ নগরের অধিবাসীরা কথা কইত ল্যাটিন ভাষায়, আর এখানে রাজত্ব করতেন এট্রুসকান নৃপতিরা। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এট্রুসকান রাজবংশ রোম থেকে বিতাড়িত হয় এবং রোমের শাসনতন্ত্র কতগুলি অভিজাত এবং ধনী পরিবারের হাতে চলে যায়। এই সব পরিবারের কর্ত্তৃত্বই হচ্ছে সে সময়ের রোমরাজ্যের গণতন্ত্র। একমাত্র ল্যাটিনভাষা ছাড়া গ্রীকরাজ্যগুলির সঙ্গে রোমের যে তখন খুব একটা প্রভেদ ছিল তা নয়।

অভিজাতবংশীয়দের কর্ত্তৃত্ব কিন্তু রোমের জনসাধারণ মেনে নেয়নি। শাসনকার্যে অংশ পাবার জন্য এবং নিজেদের স্বাধীনতার জন্য তারা ক্রমাগত আন্দোলন চালাতে থাকে। গ্রীকদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় রোমে গণতন্ত্রের সঙ্গে অভিজাততন্ত্রের দ্বন্দ্ব চলছিল। অবশেষে প্রায় সব বিধিনিষেধ ভেঙে দিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে অভিজাতদের একটা মোটামুটি আপোষ হয়ে যায়। এই অবস্থার ফলে রোম অনেক বিদেশীকেও তার নাগরিক মর্যাদা দিতে পেরেছিল।

খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে আরম্ভ হয় রোম রাজ্যের বিস্তৃতি। এর আগে পর্যন্ত তাকে এট্রুসকানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। কথিত আছে রোমের কয়েক মাইল দূরে ভিয়াই বলে এট্রুসকানদের একটি দূর্গ ছিল। রোম নাকি কোন মতেই তা অধিকার করে নিতে পারে নি।

এট্রুসকানদের দিন কিন্তু ফুরিয়ে এসেছিল। খৃষ্টপূর্ব ৪৭৪ অব্দে সিসিলির কাছে সাইরাকিউসের গ্রীকেরা তাদের নৌবহরটি ধ্বংস করে ফেলে। ঠিক এই বিপদের সময়েই আবার উত্তর দিক থেকে গথ নামক এক নরডিক জাতি তাদের আক্রমণ করে বসল। ছদিক থেকে চাপ সহ্য করতে না পেরে তারা হেরে যায় এবং পৃথিবীর পরবর্তী ইতিহাসে তাদের কোন কথাই আর শুনতে পাওয়া যায় না। এবার অবশ্য রোমানরা ভিয়াইএর দূর্গ অধিকার করে। ইতিমধ্যে গলরা রোমে ঢুকে সহরটি ধ্বংস করবার উপক্রম করে। কিন্তু জুপিটারের মন্দির ক্যাপিটল তারা কিছুতেই দখল করতে পারেনি। একদিন রাত্রে তারা চুপি চুপি মন্দিরটি আক্রমণ করবার চেষ্টা করে। কিন্তু কতকগুলি হাঁস সে সময় হঠাৎ ডেকে ওঠায় তাদের সব তোড়জোড় ব্যর্থ হয়ে যায়। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কিছু টাকাকড়ি দেওয়ার ফলে ছজাতির মধ্যে একটা আপোষ হয়ে যায় এবং গথেরা আবার ইটালীর উত্তরদিকে ফিরে যায়।

গল-আক্রমণ কিন্তু রোমানদের দুর্বল না করে বরঞ্চ

অধিকতর সবল করেছিল। খৃষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দে আরনো থেকে নেপল্‌স পর্যন্ত সমস্ত মধ্য ইতালী তাদের পদানত হয়। ম্যাসিডোনিয়া এবং গ্রীসে যখন ফিলিপের ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং আলেকজাণ্ডার যখন মিশরে এবং সিন্ধুতীরে ভীষণ আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময়ে রোমান্‌রাও ধীরে ধীরে ইটালীতে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে চলেছিল। অবশেষে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর যখন তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল তখন সভ্যজগতে রোমানরাই সবচেয়ে উন্নতিশীল জাতি বলে পরিগণিত হল।

রোম ও কার্থেজ

খৃষ্টপূর্ব ২৬৭ অব্দে রোমের সঙ্গে কার্থেজের সংঘর্ষ বাধে। ইতিহাসে এরই নাম পিউনিক যুদ্ধ। যে সময়ের কথা বলছি সম্ভবত তখন পৃথিবীর বাণিজ্যপ্রধান নগরগুলির মধ্যে কার্থেজই ছিল শ্রেষ্ঠ। কার্থেজ সাম্রাজ্য ছিল স্পেনের এব্রো-নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। কর্সিকা এবং সার্ডিনিয়া ছিল এ সাম্রাজ্যেরই অন্তর্গত। এ সাম্রাজ্যের প্রধান শক্তি ছিল তার প্রশস্ত রণতরীগুলিতে। খৃষ্টপূর্ব ২৭০ অব্দে কার্থেজ মেসিনার কাছে কতগুলি জল-দস্যুকে শাস্তি দেয়। পরাজিত দস্যুরা রোমের কাছে সুবিচার প্রার্থনা করে। রোম এদের পক্ষ অবলম্বন করাতে দুই দেশে বাধল ভয়ানক এক যুদ্ধ।

খৃষ্টপূর্ব ২৬৪ অব্দ থেকে ১৪৬ অব্দ পর্যন্ত মোট তিনটি পিউনিক যুদ্ধ হয়েছিল। প্রথমটি সিসিলিতে দীর্ঘকাল ধরে চলে। এ যুদ্ধেই রোম রণতরীর ব্যবহার ভাল করে শিখল এবং সিসিলি দখল করে কার্থেজিয়ানদের স্পেনের দিকে সরিয়ে দিল।

কার্থেজ-বাসীরা স্পেনের এব্রোনদী যেন পার না হয় এই ছিল রোমের নির্দেশ। এ আদেশ অমান্য করার ফলে আরম্ভ হল দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ। পিউনিক যুদ্ধগুলির মধ্যে

এটিই প্রধান। খৃষ্টপূর্ব ২১৮ অব্দে হ্যানিবল নামক একজন যুবক সেনাপতির পরিচালনায় কার্থেজসৈন্য নদী পার হয়। হ্যানিবল ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের মধ্যে একজন। তিনি আল্পসের মধ্য দিয়ে তাঁর সৈন্যদের স্পেন থেকে ইটালীতে পরিচালিত করলেন, রোমানদের বিরুদ্ধে গলদের যুদ্ধে নামালেন এবং কার্থেজ সৈন্যের সাহায্যে পনের বছর স্বয়ং রোমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন। ক্যানিতে এবং ট্রেসিমিন হ্রদের তীরে তিনি রোমান সৈন্যদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। রোমের মন্ত্রিসভা কিন্তু কিছুতেই বিচলিত না হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং হ্যানিবলের সঙ্গে সন্ধি করতে অস্বীকার করেন। যতদিন হ্যানিবল ইটালীতে ছিলেন ততদিন কোন রোমান সৈন্য তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারেনি। কিন্তু শেষে রোমের একটি বাহিনী মারসেলসে নেমে স্পেনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের পথ ছিন্ন করে দেয়। হ্যানিবলের সঙ্গে রোম অবরোধ করে রাখবার কোন ব্যবস্থা না থাকায় তিনি রোম দখল করে নিতে পারেননি। ইতিমধ্যে দেশে বিপ্লবের সূচনা দেখে কার্থেজের সৈন্যরা আফ্রিকায় তাদের নিজেদের নগর রক্ষার জন্য ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এই সুযোগে রোমান বাহিনী আফ্রিকায় চলে আসে এবং খৃষ্টপূর্ব ২০২ অব্দে জামার যুদ্ধে হ্যানিবলের নিজের জন্মভূমিতেই তাঁকে সর্বপ্রথম পরাজিত করে।

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের ফলে কার্থেজ স্পেন ও তার

নৌবহর রোমকে সমর্পণ করতে বাধ্য হল এবং যুদ্ধের ক্ষতি-পূরণস্বরূপ তাকে দিতে হল প্রচুর অর্থ। এমনকি প্রতিহিংসা-পরায়ন রোমানদের হাতে হ্যানিবলকে ছেড়ে দিতেও তারা বাধ্য হয়। হ্যানিবল কিন্তু পালিয়ে এসিয়ায় চলে আসেন। তবে এখানে খুব বেশী দিন তিনি লুকিয়ে থাকতে পারলেন না। শত্রুহস্তে পড়বার উপক্রম হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধের মাঝখানের ছাপ্পান্ন বৎসর বিজয়ী রোম এবং শীর্ণ পরাজিত কার্থেজের মধ্যে শান্তির বাতাসই বয়েছিল। ইতিমধ্যে রোম গ্রীস ও এসিয়ামাইনরের উপর সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল এবং মিশর ও পশ্চিম এশিয়ার ছোটখাট রাজ্যগুলিকে তার প্রভাব স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল।

ধীরে ধীরে শত্রু পদানত দুর্বল কার্থেজ আবার তার পূর্ব সমৃদ্ধির কিছুটা ফিরে পেল। কার্থেজের এই পুনরুত্থান রোমানদের মনে ভয় ও সন্দেহের উদ্রেক করল। খৃষ্টপূর্ব ১৪৬ অব্দে তারা কার্থেজকে ধ্বংস ও ভস্মীভূত করে ফেলে।

রোম সাম্রাজ্যের চার যুগ

রোম সাম্রাজ্যের প্রসারকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে। খৃষ্টপূর্ব ৩৯০ অব্দে গলেরা রোম আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যুগ আরম্ভ হয় এবং পিউনিক যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত চলে। এ যুগকে বলা যেতে পারে ক্রম-বর্ধমান সাধারণ তন্ত্রের যুগ। রোমের ইতিহাসে সম্ভবত এ যুগই সবচেয়ে ভাল। এ সময় অভিজাতদের সঙ্গে সাধারণের একটা আপোষ হয়, এট্রুসকান আধিপত্য মুছে যেতে থাকে, ধনী ও গরীবদের মধ্যে উৎকট প্রভেদ কমে আসতে থাকে এবং সারা রোম জুড়ে আমরা পাই দেশ-প্রেমিক নরনারীদের। সত্যিকথা বলতে গেলে এই সাধারণ-তন্ত্র শেষ পর্য্যন্ত এসে পড়ে স্বাধীন চাষী গৃহস্থদের হাতে।

এ যুগে রোমের পরিধি বিশ বর্গমাইলের বেশী ছিল না। চারপাশের ছোট রাজ্যগুলির সঙ্গে তাকে ক্রমাগত যুদ্ধ করতে হত। পরাজিত কয়েকটি রাজ্য আবার রোমের মধ্যেই চলে আসে এবং তাদের জনসাধারণ রোমের শাসন ব্যাপারে ভোট দেবার ক্ষমতাও পায়। কতগুলি রাজ্য স্বায়ত্তশাসন লাভ করে রোমের সঙ্গে বাণিজ্য এবং বিবাহাদি আরম্ভ করে। কতগুলি বিশেষ স্থানে দেশ রক্ষার জন্য

ভোটাধিকার প্রাপ্ত নাগরিকদের বসবাসের সুবিধে দেওয়া হয়। নতুন বিজিত রাজ্যগুলিতে উপনিবেশ স্থাপনও চলতে থাকে। প্রশস্ত দীর্ঘ রাজপথ ছিল রোমের আর একটি বিশেষত্ব। এই সব কারণে অতি শীঘ্র ইটালীর লোকেরা রোম ভাবাপন্ন হয় এবং খৃষ্টপূর্ব ৪৯ অব্দে ইটালীর সমস্ত স্বাধীন প্রজারা রোমের নাগরিক মর্যাদা লাভ করে। এরও তিনশ বছর পরে ক্রীতদাস ব্যতীত রোম রাজ্যের যেখানে যে প্রজা ছিল তাদের সকলকে নাগরিক অধিকার দেওয়া হয়। রোমে উপস্থিত হলেই তারা এই ক্ষমতার ব্যবহার করতে পারত।

কিন্তু ক্রমে অন্য এক নতুন প্রথার প্রবর্তন হল। বিজিত রাজ্যগুলিকে রোম জমিদারীর ন্যায় দেখতে লাগল এবং সে সকল স্থানের গরীব প্রজাদের রক্ত-জল-করা পয়সা রোমের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ধনবৃদ্ধি করতে আরম্ভ করল।

প্রথম পিউনিক যুদ্ধের আগে রোমের অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল চাষী গৃহস্থ। সৈনিকের কায ছিল তাদের কর্তব্য ও গৌরব উভয়ই। কিন্তু ক্রমাগত সৈনিকের কায করার ফলে তাদের জমির প্রচুর ক্ষতি হতে থাকে। অতএব কৃষিকার্য করবার জন্য ক্রীতদাসের ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। এইভাবে রোমে চাষী গৃহস্থদের আমল চলে গিয়ে আরম্ভ হল ধনীদের যুগ।

এই সময় রোমের শাসন ব্যাপারে আমরা একটি জিনিষ

লক্ষ্য করি। যে দুটি সভা রোমের শাসন কার্য চালাত তাদের মধ্যে ক্ষমতায় ও প্রতিপত্তিতে প্রধান ছিল সেনেট। প্রথমে এ সভার সভ্য-সংখ্যা অভিজাতবংশীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরে সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকেই এখানে আনবার চেষ্টা হত; চেষ্টা করতেন অবশ্য রাজ্যের বড় বড় কর্মচারী এবং কনসালেরা। পিউনিক যুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে ক্রমাগত তিনশ বছর ধরে রোমের সমস্ত রাজনীতি এবং প্রতিপত্তির কেন্দ্রস্থল ছিল সেনেট।

দ্বিতীয় সভাটি ছিল জনসাধারণের সভা। রোমের প্রত্যেক নাগরিক এ সভার সভ্য হতে পারত। রোম যখন বিশ বর্গমাইলের ছোট্ট একটি রাজ্য ছিল তখন সমস্ত নাগরিকদের একত্র মেলা হত সম্ভব। কিন্তু তারপর রোমের পরিধি যখন অনেক বেড়ে গেল তখন এই সভাটির কায হয়ে উঠল প্রায় অসম্ভব। ক্যাপিটল এবং নগর প্রাচীর থেকে শিঙা বাজিয়ে জন সাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হত যে সভা বস্‌বে। আর তা শুনে যত অকর্মণ্য লোক এসে সভায় জড় হত। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এই সভা সত্যিই অনেক বিষয়ে সেনেটের কার্যে প্রভাব সঞ্চার করে রোমে জনসাধারণের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করত। কিন্তু পিউনিক যুদ্ধের শেষে দেখা গেল যে এ সভার পূর্বেকার ক্ষমতার ছায়া পড়ে আছে মাত্র। কার্য নির্ধারণের আসল ক্ষমতা চলে গেছে ধনী লোকদের কাছে।

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের আগে রোমের সৈনিকেরা ছিল নাগরিক ক্ষমতা প্রাপ্ত চাষীর দল। তারা কখনও ঘোড়ায় চড়ে কখনও পায়ে হেঁটে যুদ্ধে যেত। দেশের কাছাকাছি যুদ্ধ হলে অবশ্য এই রকম সৈন্যদের কাযে লাগান যেত, কিন্তু দূর বিদেশে গিয়ে প্রচুর কষ্ট সহ্য করে দীর্ঘকাল ধৈর্যের সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা এদের ছিল বলে মনে হয় না। আর ক্রীতদাস এবং জমিদারীর সংখ্যা যতই বাড়তে লাগল এই সব তেজস্বী চাষী সৈনিকদের সংখ্যাও কমে যেতে লাগল। সৈন্য-সংখ্যা যখন এমনি ভাবে কমে আসছিল তখন মেরিয়াস নামক একজন নেতা সৈন্য সংগ্রহের এক নতুন উপায় বের করলেন। কার্থেজের পরাজয়ের পর উত্তর আফ্রিকায় নিউমিডিয়া নামে এক রাজ্যের পত্তন হয়। এই রাজ্যের রাজা জিউগার্থাকে দমন করতে রোম প্রায় নাকাল হয়ে গিয়েছিল। এই লজ্জাস্কর যুদ্ধ শেষ করতে রোমের অধিবাসীরা মেরিয়াসকে কনসাল নিযুক্ত করল। মেরিয়াস মাইনে করা সৈন্য কাযে লাগালেন এবং কৃতকার্য হলেন। তারপর তাঁর কায যখন শেষ হয়ে গেল তখন এই সব বেতনভোগী সৈন্যের সাহায্যে তিনি অন্যায় ভাবে কনসালের পদ আঁকড়ে ধরে রইলেন। তাঁকে দমন করার মত শক্তি কারুর হল না।

মেরিয়াসের সঙ্গে সঙ্গে রোমের শাসনতন্ত্রের তৃতীয় যুগ আরম্ভ হল। এবার এল সেনাপতিদের যুগ। এ সময় দেখি রোমের সৈন্যাধ্যক্ষেরা মাইনে করা সৈন্যের সাহায্য নিয়ে

দিগ্বিজয়ে ব্যস্ত। মেরিয়াস যখন নিজেকে স্বাধীন প্রতিপন্ন করতে চাইলেন তখন অভিজাতবংশীয় স্থুল্লা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। কিছুদিন উভয়ে উভয়ের সৈন্যক্ষয় করতে লাগলেন; বহুলোক হতাহত হল এবং বহুলোকের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল। এ দুজনের মৃত্যুর পর লুফুল্লাস, পম্পিয়াই, ক্রেসাস এবং জুলিয়াস সীজার একে একে একে রোমবাহিনী অধিকার করে তাঁদের আধিপত্য চালিয়ে যান।

খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর পরে রোমের সেনেট কার্যত না হক, অন্তত কাগজে কলমে শাসনতন্ত্রের কেন্দ্রস্থল ছিল। কিন্তু সত্যিকারের কোনও ক্ষমতা সেনেটের আর ছিল না। নিবু নিবু বাতির মত সেনেটের আলো হয়ে এসেছিল ম্লান। অবশ্য কনসাল এবং বড় বড় রাজকর্মচারীদের নিযুক্ত করবার ক্ষমতা এবং তাদের কার্যভার দেবার শক্তি তখনও সেনেটই করত। কিন্তু এই সব কাযের অধিকাংশই হত নিরর্থক। কেন না সৈন্যাধ্যক্ষেরা সেনেটের আজ্ঞাকে মানতে চাইতেন না। অবশ্য সেনেটের কয়েকজন সভ্য এবং বিশেষ করে সিসারো রোমের সাধারণতন্ত্রের ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা সফল হয় নি। স্বাধীন চাষী গৃহস্থদের যুগ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রোম থেকে আগেকার তীব্র নাগরিক মর্যাদা-বোধও যেন লোপ পেয়ে গিয়েছিল। সমস্ত দেশটা এ সময়ে হয়ে উঠেছিল গরীব আর ক্রীতদাসদের দেশ। তারা স্বাধীন নাগরিকদের অধিকারের মর্যাদা বুঝত না এবং

বুঝতে চাইত না। সাধারণতন্ত্রের উপাসক এই সব নেতাদের পেছনে সেনেটে তেমন কোন ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু যে সব সৈন্যাধ্যক্ষদের বিরুদ্ধে তাঁরা দাঁড়াতেন তাঁদের পশ্চাতে সৈন্যবল ছিল প্রচুর। সুতরাং সেনেটকে প্রায় অগ্রাহ্য করেই ক্রেসাস, পম্পিয়াই এবং সীজার নিজেদের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ করে নিতে চেষ্টা করেন।

বহুদিন ধরে রোমে একটি প্রথা চলে আসছিল। দেশে যখন সৈন্যের প্রয়োজন হত অতি প্রবল, তখন সৈনিক-নেতাদের মধ্যে থেকে একজনকে অসীম ক্ষমতা দিয়ে সর্বাধ্যক্ষ হিসেবে মনোনীত করা হত দেশকে বিপদ থেকে মুক্ত করবার জন্য। পম্পিয়াইকে হত্যা করবার পর সীজারকে প্রথমে দশ বছরের জন্য পরে সারা জীবনের জন্য এই সর্বাধ্যক্ষের পদ দেওয়া হয়। এ ক্ষমতার জোরে যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনিই ছিলেন রোমের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। একবার সীজারকে কাগজে কলমে রাজা করবার কথাও উঠেছিল। কিন্তু বিদেশী এট্রুস-কানদের আমল থেকে রাজা কথাটির প্রতি রোমানদের এমন একটা ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল যে সীজার নিজেই রাজা হতে অস্বীকার করলেন। তবে রাজা না হলেও সিংহাসনে বসতে এবং রাজদণ্ড গ্রহণ করতে তাঁর বাধে নি। পম্পাইএর মৃত্যুর পর সীজার মিশরে গিয়েছিলেন। সেখানকার রাণী ক্লিওপেট্রার সঙ্গে তাঁর প্রণয় হয়েছিল বলে জানা যায়। রাজাকে দেবতা বলে পূজো করবার যে রীতি মিশরে চলেছিল সীজারের তা

খুবই পছন্দ হয়ে যায়। রোমে ফিরে তিনি একটি মন্দিরে নিজের এক মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সীজারের এতদূর বাড়াবাড়ি কিন্তু রোম সহ্য করতে পারে নি। তার নিবু নিবু সাধারণতন্ত্র একেবারে স্তিমিত হয়ে যাবার আগে হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল। সেনেটের মধ্যে নিহত শত্রু পম্পাইএর মূর্তির পদতলে ছুরিকাঘাতে সীজার নিহত হলেন।

জুলিয়াস সীজারের মৃত্যুর পর আরও তের বছর রোমের সেনাপতিদের মধ্যে পূর্বেকার মত ঝগড়াঝাটি চলেছিল। লেপিডাস্, মার্ক এণ্টনী এবং সীজারের ভ্রাতুষ্পুত্র অক্টেভিয়াস্ সীজার এ কয় বৎসর রোমের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ অধিকার করে দাঁড়িয়েছিলেন। পিতৃব্যের মত অক্টেভিয়াসও রাজ্যের দরিদ্র এবং শুষ্কতর অংশগুলো বেছে নিয়েছিলেন। এই সব স্থান থেকেই তিনি তার বলিষ্ঠ এবং কর্মঠ সৈনিকদের সংগ্রহ করেন। খৃষ্টপূর্ব ৩১ অব্দে একটিয়ামের নৌযুদ্ধে এণ্টনীকে পরাজিত করে তিনি সমস্ত রোম সাম্রাজ্যের হর্তকর্তা হয়ে বসলেন। কিন্তু জুলিয়াসের চেয়ে তিনি ছিলেন অনেক চতুর। নিজেকে দেবতা বা রাজা বলে প্রচারের দুর্বুদ্ধি তাঁর কখনও হয় নি। সেনেট এবং রোমের জনসাধারণকে তিনি আগেকার স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিলেন। এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হয়ে সেনেট তাঁকে যা দিয়েছিল তা বাহ্যিক কোন আড়ম্বর

আগষ্টাস সীজার

নয়, সত্যিকারের ক্ষমতা। সেনেটের নির্দেশ অনুসারে তাঁকে রাজা না বলে বলা হত আগষ্টাস বা মহামান্য। আগষ্টাস সীজারই রোম সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট। খৃষ্টপূর্ব ২৭ থেকে ১৪ অব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেছিলেন।

আগষ্টাসের পর একে একে টাইবেরিয়াস সীজার, ক্যালিগুলা, ক্লডিয়াস, নেরো এবং শেষ পর্যন্ত ট্রাজান্, হেড্রিয়ান, এনটোনিয়াস পায়াস ও মার্কাস আরিলাস রোমে রাজত্ব করেন। এঁদের সকলেই ছিলেন সৈনিক। সৈন্যেরা এঁদের বড় করেছিল আবার তাদের জন্যই এঁদের মধ্যে অনেকের সর্বনাশ হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যে রোম থেকে সেনেটের চিহ্ন পর্যন্ত মুছে গেল। তার স্থান গ্রহণ করলেন সম্রাট এবং তাঁর সম্ভ্রান্ত কর্মচারীরা। রোম-সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করছিল। ব্রিটেনকে সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করা হয়েছিল। ট্রান্সিল্ভানিয়াকেও ডেসিয়া নাম দিয়ে সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। সম্রাট ট্রাজান ইউফ্রেটিশ অতিক্রম করেছিলেন এবং হেড্রিয়ান চীনের প্রাচীরের মত প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন উত্তর থেকে বর্বর জাতিগুলিকে বাধা দেবার জন্য। এই প্রাচীরগুলির মধ্যে একটি তৈরী হয়েছিল ব্রিটেনের মধ্য দিয়ে। আর একটি হয়েছিল রাইন ও ড্যানুবের মধ্যে। হেড্রিয়ান ট্রাজানের অধিকৃত কোন কোন দেশ পরিত্যাগও করেছিলেন।

হেড্রিয়ানের পরে রোমের প্রসার বন্ধ হয়ে যায়। ছোট্ট সহরটি থেকে যে বিরাট সাম্রাজ্যের উৎপত্তি হয়েছিল তার সীমা হল পশ্চিমে এ্যাটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে আফ্রিকার মরুভূমি আর পূবে রাইন, ড্যানুব এবং ইউফ্রেটিশ। দুশ বছর ধরে এই সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল শান্তি। আগষ্টাসের সময় থেকে মারকাস আরিলাসের রাজত্বকাল পর্যন্ত রোমের সভ্যতা ধীরে ধীরে চরমে পৌঁছায়। সামাজ্যের চতুর্দিকে চোখে পড়ে অপূর্ব কর্মব্যস্ততা—দিকে দিকে মানুষ নগর, মন্দির, রঙ্গভূমি ও বিপনী নির্মাণে রত। নদীতে বাঁধ দিয়ে সেই বাঁধ থেকে বড় বড় নগরগুলিকে জল-সরবরাহ করা হত আর প্রত্যেক নগরের সঙ্গে প্রত্যেক নগরের ছিল প্রশস্ত রাজপথের দ্বারা যোগাযোগ। এইসব সমৃদ্ধিশালী নগরের ধ্বংসাবশেষ আজও আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই বিরাট সাম্রাজ্যের যাবতীয় অধিবাসীকে একত্রে বেঁধে রেখেছিল প্রধানত তিনটি জিনিষ—ল্যাটিন ভাষা, রোমের আইন এবং প্রশস্ত রাজপথ।

কালক্রমে এই বিরাট সাম্রাজ্যেরও পড়তি দশা উপস্থিত হয়। কতগুলি বর্বর জাতি সাম্রাজ্যকে পূবে এবং পশ্চিমে বিভক্ত করে ফেলে। কনস্টানটিনোপলকে পূর্ব সাম্রাজ্যের রাজধানী করে সম্রাট কনস্টেনটাইন সেখানে রাজত্ব করেন। তারই সময় ক্রিশ্চিয়ানিটি রোমের প্রধান ধর্ম বলে পরিগণিত হয়। পশ্চিমে রোমের পতনের পর এই পূর্ব সাম্রাজ্য

আরও এক হাজার বছর বর্বর জাতিগুলির আক্রমণ ঠেকিয়ে রেখেছিল। শুধু তাই নয়, পশ্চিমে অসভ্য জাতিগুলির আক্রমণে যখন মানুষের মনোরাজ্য একেবারে অন্ধকার সেই সময় পূর্ব রাজ্যই জ্বালিয়ে রেখেছিল জ্ঞানের প্রদীপ।

রোমের সামাজিক জীবন

যে যুগের কথা বলছি আমাদের সময় থেকে তার দূরত্ব হচ্ছে প্রায় দু হাজার বছর। কিন্তু সে সময়কার রোমের সাধারণ নাগরিকের জীবন আলোচনা করলে দেখা যাবে যে সেই প্রাচীন সভ্যতা আর বর্ত্তমান ইওরোপীয় সভ্যতার মধ্যে মিল ছিল অনেকখানি।

প্রাশ্চাত্য জগতে এ সময় মুদ্রার ব্যবহার এখনকার মতই হত। ধর্মযাজক এবং রাজকর্মচারী ছাড়াও অবস্থাপন্ন লোক রোমে অনেক ছিলেন। প্রশস্ত রাজপথ আর সরাইখানার দৌলতে রোমের অধিবাসীরা অনেকেটা অবাধে দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণ করতে শিখেছিল। সাম্রাজ্যের এক প্রদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য প্রদেশের সংস্কৃতির কিন্তু ছিল অনেক পার্থক্য।

ব্রিটেন, গল প্রভৃতি যে সব দেশে নগর, মন্দির এবং সভ্যতার প্রসার বিশেষ ছিল না সে সব স্থানে ল্যাটিন ভাষার প্রচলন হয়েছিল বহুল এবং ল্যাটিন ভাবধারার প্রচারও হয়েছিল ব্যাপক। বাস্তবিক পক্ষে রোমই এই দেশগুলিকে সভ্য করেছিল। উত্তর পশ্চিম আফ্রিকাতেও ল্যাটিনের ব্যবহার আরম্ভ হয়।

কিন্তু গ্রীস, এসিয়া মাইনর, মিশর ও প্রাচ্য দেশগুলিতে ল্যাটিন ভাষার ব্যবহার প্রসার লাভ করেনি। এগুলিতে গ্রীকের প্রচলনই ছিল বেশী। এমন কি রোমেও গ্রীক ভাষাজ্ঞানকেই প্রকৃত পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক বলে ধরে নেওয়া হত। রোমের উচ্চশিক্ষিত লোকেরা ল্যাটিনের চেয়ে গ্রীক ভাষারই অনুরাগী ছিলেন বেশী।

এই বিরাট সাম্রাজ্যের কাযকর্ম এবং ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়ম ছিল বিবিধ। কৃষিকাযই ছিল অধিকাংশ লোকের প্রধান জীবিকা। ইটালীতে গোড়ায় যে সব স্বাধীন চাষী গৃহস্থেরা রোমের সাধারণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ ছিল কার্থেজের সঙ্গে যুদ্ধের পর তাদের আর সেদিন ছিল না; চাষের কায চলে গিয়েছিল ক্রীতদাসদের হাতে।

যে সব ক্রীতদাস জমির কাজ করত তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল বিদেশী বন্দী। তারা লিখতে পড়তে জানত না এবং তাদের কোন রকম রাজনৈতিক ক্ষমতাও দেওয়া হয় নি। যদিও এধরণের দাসেরাই ছিল দেশে সংখ্যায় অধিক তবু তারা কোন দিন বিদ্রোহ করে নিজেদের কোন সুবিধে করে নিতে পারে নি। শুধু কৃষিকার্য নয় সর্ব প্রকার শিল্প এবং বাণিজ্যেও ক্রীতদাসের আবশ্যক হত। খনির কায, নৌকো বওয়া, রাস্তা তৈরী প্রভৃতি সব কষ্টসাধ্য কার্যই করত ক্রীতদাসেরা। তা ছাড়া, গৃহকর্ম তো ছিল তাদেরই কার্য।

ক্রীতদাস ব্যতীত স্বাধীন দরিদ্র প্রজাও রোমে ছিল।

আবার আগে ক্রীতদাস ছিল পরে স্বাধীন হয়েছে এমন লোকের সংখ্যাও যে নেহাৎ কম ছিল তা নয়। এই সব দরিদ্র প্রজারা কখনও নিজেদের কায নিজেরা করে, কখনও সামান্য বেতনে ধনীদের কায করে দিয়ে জীবিকা অর্জন করত। বেতনধারী এই সব লোকেরা রোমের সমাজে অনেক নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। মধ্যে মধ্যে তারা ক্রীতদাসদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেও ছাড়ত না। তাছাড়া ক্রীতদাসদের মধ্যেও ছিল নানাপ্রকারের শ্রেণীভেদ। কাউকে রাত্রে শৃঙ্খলিত অবস্থায় রাখা হত এবং চাবুকের ঘায় কায করান হত; কাউকে আবার স্বাধীন চাষীর মত স্ত্রী পুত্র সহ জমি চাষ করতে সুবিধে দেওয়া হত। অবশ্য চাষের অধিকাংশ আয় পেতেন জমিদার।

শিক্ষিত ক্রীতদাসেরও অভাব ছিল না। রোম যখন গ্রীস, উত্তর আফ্রিকা, এসিয়া মাইনর প্রভৃতি সুসভ্য দেশগুলি জয় করে তখন সে সব দেশ থেকে বহু উচ্চ শিক্ষিত লোককে বন্দী করে নিয়ে আসা হয়। কখনও সম্ভ্রান্তবংশীয় কোন ছেলের শিক্ষক হিসেবে, কখনও কোন ধনী লোকের পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ হিসেবে, কখনও বা কোন রোমান পণ্ডিতের সেক্রেটারী হিসেবে এই সব শিক্ষিত দাসদের নিযুক্ত করা হত। বই নকল, সোনারূপোর কায এবং অন্যান্য অনেক দুরূহ কায ক্রীতদাসদের দিয়ে করান হত।

পারিবারিক জীবন বলতে রোম সাম্রাজ্যে বিশেষ কিছু ছিল না। অতি অল্পসংখ্যক লোকই মিতাচারীর জীবন যাপন

করত। অধ্যয়ন এবং স্বাধীন চিন্তার অভ্যাস ছিল অতি কম। বিদ্যায়তনগুলির সংখ্যা আঙুলে গোনা যেত। স্বাধীন ইচ্ছা এবং সংস্কারমুক্ত মনের দেখা মিলিত কচিৎ কখনও। প্রশস্ত রাজপথ, বিশাল অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, রোমের আইন এবং শাসন ক্ষমতা দেখে ভুললে চলবে না যে রোম সাম্রাজ্যের একটা অন্ধকারের দিকও ছিল।

খৃষ্টের মৃত্যুর দুশ বছর পর থেকে আরম্ভ হল এ সাম্রাজ্যের দুর্দিন। রোম এত দূর্বল হয়ে পড়ল যে তার বর্বর শত্রুদের সে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। এ দূর্বলতার প্রধান কারণ ছিল এক ভীষণ মড়ক। ১৬৪ থেকে ১৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রোম সাম্রাজ্য এই মহামারীর আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এই সময়েই আমরা প্রথম দেখি যে রোম শত্রুদের আর রুখতে পারছে না। কোন না কোন স্থানে ফাঁক পেয়ে তারা সাম্রাজ্যের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। গথ নামক এক নর্ডিক জাতি হুনের ভয়ে ড্যান্যুব নদী পার হয়ে এগুতে থাকে এবং এক যুদ্ধে সম্রাট ডেশিয়াসকে হারিয়ে দেয়। ফ্রাঙ্ক নামক আর একটি জার্মান জাতিও দক্ষিণ রাইন পার হয়ে এলশেসে প্রবেশ করে। বলকান উপত্যকায় গথদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে রোম অস্থির হয়ে ওঠে। রোমের এতদিনের আত্মবিশ্বাস ও গর্ব যেন কোথায় লোপ পেয়েছিল। তবে এ পড়তি দশাতেও রোম ছিল তার শত্রুদের নিকট সভ্যজগতের কেন্দ্রস্থল, আইন ও ধর্মের জন্মদাতা ও রক্ষক।

যীশুখৃষ্ট

আমাদের মনে রাখা দরকার যে সহস্র বৎসরের রোম শাসনে জগতে অনেক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটেছিল। এই সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে প্রধান হচ্ছে খৃষ্টান ধর্মের অভ্যুত্থান। যীশু প্রথম রোম সম্রাট আগস্টাস সীজারের রাজত্বকালে জুডিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি যে রাজ্যের কথা তাঁর শিক্ষায় বলেছেন তা পৃথিবীর কোন রাজ্য নয়, সে রাজ্যের অস্তিত্ব মানুষের মনে। যে স্বর্গরাজ্যের উল্লেখ তিনি করেছিলেন তা পেতে হলে মানুষকে তার মনের সমস্ত ময়লা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। তাঁর সমসাময়িক জগত যে তাঁর শিক্ষার অনেক কথাই বুঝে উঠতে পারেনি তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আজ মানুষ সভ্যতার ধাপে এত এগিয়ে গিয়েও খৃষ্টান ধর্মের মর্মকথা কতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছে?

খৃষ্টীয় প্রথম দুই শতাব্দী ধরে রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে খৃষ্টান ধর্মের প্রসার হতে থাকে। এই নব ধর্মের অনুপ্রেরণায় আমরা নতুন ভাবধারা এবং নতুন ইচ্ছে নিয়ে এক শ্রেণীর লোককে রোম সাম্রাজ্যে জন্মাতে দেখি। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতাব্দীতে এই নব ধর্মের অভ্যুত্থানকে দাবিয়ে

রাখবার জন্য অনেক চেষ্টা হয়। সম্রাট ডায়োক্লিশিয়ানের আমলে কি ভাবে খৃষ্টানদের উৎপীড়িত করা হত সে সব কথা শুনলেও এ যুগের মানুষের হৃৎকম্প হয়। চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া, বাইবেল ও খৃষ্টান ধর্মগ্রন্থগুলির ধ্বংস সাধন করা, খৃষ্টানদের রোমের আইনের আশ্রয় থেকে বিচ্যুত করা, নব ধর্মাবলম্বী লোকেদের নানা ঘৃণিত উপায়ে হত্যা করা—এই সব ছিল সে যুগের রোম সাম্রাজ্যের নিত্য-নৈমিত্তিক কায।

সমস্ত পশ্চিম ইওরোপ যখন বর্বর জাতিগুলির আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল তখন খৃষ্টান চার্চই রেখেছিল জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে। এর কিছুদিন পরে খৃষ্টান ধর্মকেই রোম সাম্রাজ্যের একমাত্র ধর্ম বলে মেনে নেওয়া হয়। পঞ্চম শতাব্দী থেকে রোমে যত ধর্মমন্দির নির্মিত হয় সেগুলি সবই ছিল গীর্জা।

রোম সাম্রাজ্যের পতন

খৃষ্টীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ শতাব্দী—এই দুশ বৎসর রোমকে অনবরত কতগুলি বর্বর জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। ফ্রাঙ্ক, পূর্বগথ, পশ্চিমগথ, ভ্যাণ্ডাল প্রভৃতি বর্বর জাতিগুলি সাম্রাজ্যের কয়েকটি অংশ একেবারে বিধ্বস্ত করে ফেলেছিল। এসিয়ায় রোম সাম্রাজ্যের অবস্থাও খারাপ হয়ে আসছিল। শক্তিশালী নবীন পারস্যের আক্রমণে ক্রমশই তা কুঞ্চিত হয়ে যাচ্ছিল।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি ইওরোপের সমগ্র রোম-রাজ্য বর্বর দস্যু সৈনিকের করতলগত হয়ে পড়েছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। রোমরাজ্যের গোড়ার দিকে ফ্রান্সে, স্পেনে, ইটালীতে এবং বলকান উপত্যকায় যে সব নগরী গড়ে উঠেছিল তারা এ যুগেও বর্তমান ছিল বটে তবে তাদের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছিল। এ সব নগরের অধিবাসীরা প্রায়ই ঘৃণিত ও অনিশ্চিত জীবন যাপন করতে বাধ্য হত। সম্রাটের নামে রাজকর্মচারীরা শাসনের কায চালাত কিন্তু জনসাধারণের সম্রাটের উপর বিশ্বাস কতদূর ছিল তা ভাববার বিষয়। খৃষ্টান চার্চও ধর্মপ্রচারের কায চালাত, তবে ধর্ম-যাজকদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন

অশিক্ষিত। কুসংস্কার, ভয় এবং শিক্ষার অভাবই ছিল রোমের এই পড়তির যুগের সব চেয়ে বড় তিনটি রোগ।

শুধু নাগরিক জীবনের নয় গ্রাম্য জীবনেরও যথেষ্ট অবনতি ঘটেছিল। রাজ্যের কোন কোন অংশে অনবরত যুদ্ধ এবং মহামারীর দরুন কর্ষণযোগ্য স্থান পতিত ভূমিতে পরিণত হয়েছিল। পথ ও বনভূমি হয়ে উঠেছিল দস্যু তস্করের লীলা স্থল। অরাজকতার এই তাণ্ডব লীলায় রোমের নিরীহ অধিবাসীদের প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত তখন বর্বর জাতিরা একে একে রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ রোমে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করেই সন্তুষ্ট ছিল; কেউ কেউ আবার বিজিত সুসভ্য জাতির সঙ্গে মেলামেশা বিবাহ ইত্যাদি নানা সামাজিক অনুষ্ঠান আরম্ভ করে দিয়ে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করছিল। কিন্তু জুট, এঙ্গেল, সেক্সন প্রভৃতি যে সব অসভ্য জাতি রোমের অন্তর্গত ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ দখল করে তারা ছিল সবই চাষী। নগরের আবশ্যকতা তারা জানত না, সুতরাং ব্রিটেনে ঢুকে দক্ষিণের সমস্ত রোম-ভাবাপন্ন অধিবাসীদের তারা সরিয়ে দিল, ল্যাটিন ভাষার স্থানে আনল টিউটনিক ভাষা এবং এই টিউটনিক ভাষা থেকেই শেষ পর্যন্ত উৎপত্তি হল বর্তমান ইংরাজির।

অল্পদিনের মধ্যেই ইওরোপ আর এক ভয়াবহ-বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। লুণ্ঠনকারী মোঙ্গল জাতীয় হুন বা তাতারের দলই এ বিপদ নিয়ে আসে। পীতকায় হুনেরা

ছিল অসাধারণ কর্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু। কী অদ্ভুত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে যে তারা লুটতরাজ করত তা না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। ইওরোপের অসভ্য বর্বর জাতিরাও হুনের ভয়ে একস্থান হতে অন্যস্থানে পালিয়ে যেত।

এই মোঙ্গলীয় যাযাবরদের পশ্চিমদিকে আসবার দুটি কারণ থাকতে পারে। একটি হচ্ছে চীন সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি; অন্যটি হচ্ছে রোম সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা। রোমের পরবর্তী শাসনতন্ত্রের হর্তাকর্তারা দেশের জীবনী শক্তিকে চুষে খেয়ে ফেলেছিলেন বললেও চলে। এসিয়ার জনসংখ্যা ক্রমশই বেড়ে উঠছিল এবং রোম রাজ্যের জনসংখ্যা অনবরত কমে আসছিল। তাছাড়া এক দেশ থেকে অন্যদেশে যাবার পথ ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায়। এ সব কারণগুলি যদি আমরা মনে রাখি তাহলে রোমে হুন আক্রমণ খুব আশ্চর্য বলে মনে হয় না।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধে হুনদের মধ্যে এটিলা নামে এক মহা পরাক্রান্ত নেতার উদ্ভব হয়। এটিলার সৈন্যেরা ইওরোপ ধ্বংস করতে করতে কনস্টানটিনোপলের প্রাচীর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। প্রচুর অর্থের দ্বারা থিওডোশিয়াস শেষ পর্যন্ত এটিলাকে বশীভূত করেন এবং গোপনে তাকে হত্যা করবার চেষ্টারও ত্রুটি করেন নি।

এখান থেকে অন্যদিকে ফিরে এটিলা রোমসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ল্যাটিনভাষী দেশগুলো নষ্ট করে দিয়ে গল আক্রমণ

করে। উত্তর গলের প্রত্যেকটি সহর আক্রান্ত ও বশীভূত হয়। এই ভীষণ ব্যাপার দেখে ফ্রান্স, ভিসগথ এবং ইওরোপের অন্যান্য জাতিরা একযোগে তাকে বাধা দেয় এবং চেলোনের যুদ্ধে এটিলাকে হারিয়ে দেয়। এই যুদ্ধে নাকি ১,৫০,০০০ থেকে ৩,০০,০০০ সৈন্য হত হয়েছিল। পরাস্ত হবার পর এটিলা গলে আর অগ্রসর হল না। তবে এই পরাজয়ে যে তার সামরিক উপকরণ একেবারে নষ্ট হয়ে গেল তা নয়। পর বৎসর ভিনিসিয়ার পথে ইটালীতে এসে সে একুইলিয়া এবং প্যাডুয়া পুড়িয়ে দিল এবং মিলান লুণ্ঠন করল। উত্তর ইটালীর এই সব সহর থেকে পালিয়ে বহু লোক এড্রিয়াটিক সাগরের মুখে অবস্থিত পর্বতমালায় আশ্রয় নেয়। এমনি করেই মধ্যযুগের ইওরোপের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র ভেনিসের সূত্রপাত হয়।

৪৫৩ খৃষ্টাব্দে বারগণ্ডির কোন রাজকুমারীর সঙ্গে এটিলার বিবাহ উপলক্ষে এক বিরাট ভোজনের আয়োজন হয়; এই ভোজের অব্যবহিত পরেই হঠাৎ এটিলার মৃত্যু হল। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার বিরাট সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল।

মধ্য এবং পশ্চিম ইওরোপ জুড়ে এসময় বর্বর জাতির নেতারা কেউ রাজা, কেউ ডিউক কেউ বা অন্য কোন নামে রাজত্ব করছিলেন। প্রকাশ্যে রোম সম্রাটের আধিপত্য স্বীকার করলেও কার্যত: তাঁরা ছিলেন স্বাধীন। সমস্ত

ইওরোপে এরকম শাসনকর্তার সংখ্যা ছিল সহস্র সহস্র। গল, স্পেন, ইটালী এবং ডেশিয়ায় এ সময় পর্যন্ত এক রকম বিকৃত ল্যাটিন ভাষার ব্যবহার হত। কিন্তু ব্রিটেনে এবং রাইন নদীর পূবের সকল দেশে জার্মান শাখার কোন না কোন ভাষার ব্যবহার আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল।

বীণাবাদিনী
(প্রাচীন মিশর)

যে আইনের মর্যাদা রক্ষার জন্য রোম জগৎজোড়া প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল ধীরে ধীরে তাও রোমের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছিল। সাম্রাজ্যের প্রত্যেক স্থানে জীবন যাত্রা হয়ে উঠ্ছিল বিপদসঙ্কুল। দুর্বলের ধনসম্পত্তি রক্ষা করা এক রকম অসম্ভব ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। ক্রমেই ক্যাসেল নামক দুর্গাকৃতি প্রাসাদের সংখ্যা ইওরোপে বাড়তে থাকে এবং পথঘাটের সংখ্যা যেতে থাকে কমে। এই দুর্দশার মধ্যে যখন ষষ্ঠ শতাব্দী দেখা দিল তখন পাশ্চাত্য জগৎ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। যদি খৃষ্টান সন্ন্যাসী এবং ধর্মযাজকগণ সে সময় না থাকতেন তা হলে ল্যাটিন চর্চা সম্ভবতঃ একেবারে লোপ পেয়ে যেত।

কী করে রোম এত উঠেছিল, কেনই বা এ সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে অনেক কারণ দেখাতে হয়। রোমের উন্নতির প্রধান কারণ ছিল নাগরিক মর্যাদার মধ্য দিয়ে সব অধিবাসীদের একতা বোধ। রোম সাম্রাজ্যের

প্রথম যুগে এমন বহু লোক বাস করত যারা রোমের নাগরিক মর্যাদা সম্বন্ধে ছিল অত্যন্ত সচেতন। রোমের নাগরিক সম্মান লাভকে তারা একাধারে কর্তব্য এবং গৌরব বলে মনে করত। এ সম্মানের অধিকারী হলে কেউ রোমের জন্য প্রাণ দিতে মুহূর্তও ইতস্ততঃ করত না। পিউনিক যুদ্ধের সময় থেকে ধন ও দাসত্ব প্রথার বৃদ্ধি হওয়াতে নাগরিক মর্যাদা সম্বন্ধে আগেকার উচ্চ ধারণা আর ছিল না। আগের চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যক অধিবাসীকে নাগরিক অধিকার দেওয়া হচ্ছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু আগেকার নাগরিকদের মত আত্মত্যাগের ক্ষমতা পরের যুগের নাগরিকদের ছিল না। ধীরে ধীরে অত্যধিক বিলাসিতা, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক দুর্নীতি, দাসত্ব প্রথার অতিশয় প্রসার, নাগরিক চেতনার বিলুপ্তি এবং বর্বর জাতিগুলির পুনঃ পুনঃ আক্রমণ রোম রাজ্যকে পঙ্গু করে ফেলল।

মধ্যযুগের ভারতবর্ষ

খৃষ্টীয় ৬৭৭ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর ভারতের ইতিহাসে এক অন্ধকার যুগ চোখে পড়ে। এ সময় থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে মহম্মদ ঘোরীর রাজত্বকাল পর্যন্ত একটানা ইতিহাস রচনা করতে গেলে যে সব মাল মসলার আবশ্যক তার মধ্যে অনেকগুলিই আমরা পাই না। অবশ্য ভারতের কোন কোন অংশে এ যুগেও যে এক একজন শক্তিশালী রাজা জন্মান নি এমন নয়। কনৌজের রাজা যশোধর্মন ৭৩১ খৃষ্টাব্দে চীনের রাজদরবারে দূত পাঠিয়ে ছিলেন বলে জানা যায়। উদ্দেশ্য ছিল মিত্রতা বন্ধন দৃঢ় করবার প্রয়াস। আনুমানিক ৭৫০ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশে পালবংশের আধিপত্য সুরু হয় এবং এ বংশের কয়েকজন নরপতি ভারতের ইতিহাসে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পালবংশের সব চেয়ে বিখ্যাত রাজার নাম হচ্ছে ধর্মপাল। ৯৯৭ খৃষ্টাব্দ থেকে গজনীর সুলতান মামুদ ভারতবর্ষে পুনঃ পুনঃ হানা দিতে থাকেন। তিনি বহুবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং ইতিহাসের দিক থেকে মূল্যবান অনেক মন্দির ও প্রাসাদ ধ্বংস করে ফেলেন। তাঁর

সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক অতি শোচনীয় ঘটনা। ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে অল বেরুণীর ভারত ভ্রমণ আর এক স্মরণীয় ঘটনা। ইনি ভারতের ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের এক অতি সুন্দর বিবরণ রেখে গিয়েছেন। এই বিবরণ থেকে আমরা সে সময়কার ভারতবর্ষের এক বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস সংগ্রহ করতে পারি। দিল্লীর শেষ হিন্দুরাজা পৃথ্বীরাজকে হারিয়ে দিয়ে ১১৯১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক এক নতুন রাজত্ব স্থাপন ভারতের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিল। এ সময় থেকে ভারতে মুসলমান শক্তির উত্থান আরম্ভ হল। ভারতে মুসলমান প্রাধান্যের সুরু হলেও এ যুগে কোন কোন হিন্দু-রাজা যে শক্তি এবং সমৃদ্ধির পরিচয় দেন নি তা নয়। দাক্ষিণাত্যে চালুক্য এবং চোলবংশ এ সময় ভারতের ইতিহাসে একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছিলেন। চোলবংশের রাজা প্রসিদ্ধ রাজেন্দ্র চোল যে দক্ষিণ ভারতের অনেকখানি অধিকার করেছিলেন তাই নয়, নৌ-শক্তির সাহায্যে ভারত মহাসাগরের অনেক স্থানেই ইনি আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন।

প্রাচীন পক্ষিচিত্র, সিংহল

কিন্তু দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর সম্বন্ধে কিছু না বললে মধ্য যুগের ভারতবর্ষের বিবরণ অত্যন্ত অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আনুমানিক ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত

বিজয়নগরের সমৃদ্ধি চলতে থাকে। এই অদ্ভুত হিন্দুরাজ্যটির সম্বন্ধে সকল বিদেশী পর্যটকই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ১৪২০ খৃষ্টাব্দে নিকলো কন্টি নামক একজন ইটালীয়ান, তারপর আবদার রাজ্জাক নামে একজন মুসলমান পর্যটক এবং ১৫২২ খৃষ্টাব্দে পিস নামে একজন পর্তুগীজ এই রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। তাঁরা সকলেই এ রাজ্যের ঐশ্বর্য এবং সৌন্দর্য দেখে মোহিত হয়েছিলেন। সোনারূপো, হীরে, মানিক্য এবং হাতীর দাঁতের অপরূপ কারুকার্যে নাকি পৃথিবীর কোন দেশ বিজয়নগরের সমকক্ষ ছিল না। বিজয়নগরের পরিধি ছিল নাকি রোমের সমান; আর তার মধ্যে যে সব সুন্দর সুন্দর হ্রদ, বাগান আর প্রাসাদ ছিল তা গুণে শেষ করাও ছিল শক্ত। দুঃখের বিষয় এ রাজ্যের পতন হয়েছিল অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে।

প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে নির্মিত সিংহমূর্তি

মধ্য যুগে ভারতের গ্রামে গ্রামে আমরা পঞ্চায়েতের প্রাধান্য দেখতে পাই; সুতরাং কতগুলি বিষয়ে জনসাধারণের অধিকার অটুট ছিল তা মানতেই হবে।

এ যুগে ভারতবর্ষে যে সব ধর্মসংস্কারক এবং সাধক জন্মেছিলেন তাঁদের মধ্যে আমরা উত্তর ভারতে রামানন্দ, কবীর, নানক ও শ্রীচৈতন্য এবং দক্ষিণ ভারতে শঙ্করাচার্য এবং রামানুজাচার্যের নাম করতে পারি।

বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর হাজার বছর পর্যন্ত গ্রীকভাষী পূর্ব সাম্রাজ্য তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছিল। একে বলা হত বাইজেনটাইন সাম্রাজ্য। বাইজেনটিয়ান ছিল একটি প্রাচীন সহর। তারই উপর পরে নতুন নগর কনষ্টানটিনোপল নির্মিত হয়। বাইজেনটিয়ান কথাটি থেকেই পরে বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যের প্রচলন হয়েছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে যে ঝড়ঝাপটা পশ্চিমের রোম রাজ্য ভেঙে দিয়ে চলে গেল তা কিন্তু বাইজেনটাইন সাম্রাজ্যকে নষ্ট করতে পারে নি। এটিলা কনষ্টানটিনোপলের প্রাচীর পর্যন্ত তার ধ্বংসকার্য চালিয়েছিল; নগরটি কিন্তু দাঁড়িয়েছিল অক্ষুণ্ণ অবস্থায়।
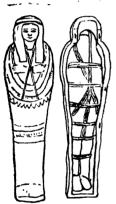
মমি ও তার বহিরাবরণ
(প্রাচীন মিশর)

ষষ্ঠ শতাব্দীতে পূর্ব সাম্রাজ্যের অনেক উন্নতি হয়। প্রথম জাষ্টিনিয়েন ৫২৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন খুবই উদ্যমশীল এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। রাণী থিওডোরাও ছিলেন স্বামীর উপযুক্ত পত্নী। জাষ্টিনিয়েন ভ্যাণ্ডালদের

হাত থেকে উত্তর আফ্রিকা এবং গথদের কাছ থেকে ইটালীর প্রায় সমস্তটাই পুনরায় অধিকার করে নেন। দক্ষিণ স্পেনও তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়ে পড়েছিল। শুধু স্থলযুদ্ধ এবং নৌযুদ্ধ করে তিনি তাঁর সব উদ্যমের অপব্যবহার করেন নি তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালর স্থাপন করেন, কনষ্টানটিনোপলে সেণ্ট সোফিয়ার গীর্জা নির্মাণ করেন এবং রোমান আইন একত্রিত করে লিপিবদ্ধ করান। কিন্তু তাঁর নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যাতে না হয় সেজন্য তিনি প্লেটোর সমসাময়িক অতি প্রাচীন গ্রীক বিদ্যায়তনগুলি জোর করে বন্ধ করিয়ে দেন।

তৃতীয় শতাব্দী থেকে নবজাগ্রত পারস্য সাম্রাজ্য পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বীর আসন অধিকার করে বসেছিল। দুদিকে দুটি প্রবল প্রতাপান্বিত সাম্রাজ্য থাকায় এসিয়া মাইনর, সিরিয়া এবং মিশরের অশান্তির অন্ত ছিল না। কিন্তু এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এ দুটি সাম্রাজ্য একযোগে বর্বর জাতিগুলিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত কিনা সন্দেহ। তুর্কী বা তাতারেরা প্রথমে এক সাম্রাজ্যের পরে অন্য সাম্রাজ্যের সহযোগী হিসেবে পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে দুই সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল জাষ্টিনিয়ান এবং প্রথম খসরুর পরিচালনায়। পূর্ব সাম্রাজ্য পারস্যের সঙ্গে একটা বড় রকমের যুদ্ধও করে। কিন্তু রোম রাজ্যের সঙ্গে পারস্যের এই হল শেষ যুদ্ধ। তখন কেউ

স্বপ্নেও ভাবে নি যে আরবের মরুভূমিতে কাল মেঘ জমছে। শীঘ্রই এমন ঝড় উঠবে যা চিরকালের মত দুটি সাম্রাজ্যের এই সব অনর্থক যুদ্ধের অবসান ঘটাবে।

তবু জাষ্টিনিয়েনের পর হাজার বছর পর্যন্ত রোম সম্রাটেরা আরব, তুর্কী, শ্লাভ ও অন্যান্য শত্রুর হাত থেকে কনষ্টানটিনোপল রক্ষা করে আসছিলেন। অবশেষে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কীরা এই প্রসিদ্ধ নগরকে অধিকার করে নেয় এবং তাদেরই হাতে এখন পর্যন্ত এ সহর রয়েছে। দশটি গুরুত্বপূর্ণ শতাব্দী ধরে কনষ্টানটিনোপলেই প্রাচীন গ্রীক-জ্ঞানের প্রদীপকে জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল। যে পর্যন্ত পশ্চিম ইওরোপে জ্ঞানের অভ্যুদয় ঘটে নি সে পর্যন্ত একদিনের তরেও এ প্রদীপ শিখা ম্লান হয় নি। মানব সভ্যতার নিকট গ্রীকভাষী পূর্ব সাম্রাজ্যের এই ছিল শ্রেষ্ঠ দান।

মহম্মদ এবং আরব জাতি

আরব জাতির ঘুমন্ত প্রাণে যিনি প্রথমে সোনার কাঠি ছোঁয়ালেন সেই মহম্মদ ছিলেন গোড়াতে একজন বেদুইন নেতা। ৫৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আদি বাস ছিল মদিনা নগরীতে। এক ধনী বিধবাকে বিবাহ করে তিনি মক্কা নগরীতে বসবাস সুরু করেন। সে যুগে মক্কায় ছিল পৌত্তলিকদের বাস; তারা কাবা নামক একটি কালো পাথরের পুজো করত।

বর্বর পৌত্তলিক অনুষ্ঠানগুলি মহম্মদকে অত্যন্ত ব্যথিত করে এবং চল্লিশ বৎসর যখন তাঁর বয়স তখন তিনি ধর্ম-প্রচারকের কার্য আরম্ভ করেন। সর্বপ্রথম তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে "সত্য একমাত্র ভগবানের" কথা বলেন এবং পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কারের তথ্য ব্যাখ্যা করেন। মনে হয় ইহুদী ও খৃষ্টান ভাবধারা তাঁর ধর্মচিন্তাকে অনেকখানি অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর ধর্মমতে বিশ্বাসী কয়েকজন অনুচরকে সংগ্রহ করে তিনি মক্কার পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম অভিযান আরম্ভ করেন। কাবার তীর্থই ছিল সে সময়কার মক্কানগরীর সমৃদ্ধির কারণ; সুতরাং পৌত্ত-লিকতার বিরুদ্ধে প্রচার কার্য আরম্ভ করে তিনি যে খুব

অপ্রিয় হয়ে পড়েছিলেন তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তিনি ভয় পান নি; বরং অধিকতর উদ্যমে তিনি নিজের ধর্মপ্রচার এবং প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্মের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে থাকেন। তিনি বললেন যে তিনিই হচ্ছেন খোদার প্রেরিত শেষ পয়গম্বর। ভগবান প্রচলিত ধর্মের গলদ দূর করবার জন্যই তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁর সমস্ত অনুচরদের আবেদন জানালেন যে যদি আবশ্যক হয় তাহলে তরবারি হস্তে ধর্মপ্রচার করতেও তারা যেন ভয় না পায়।

হঠাৎ এমনি করে আরবেরা সভ্যজগতের সামনে তাদের মনের ঐশ্বর্য খুলে দাঁড়াল। তাদের ভাষা ও শাসন স্পেন থেকে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসার লাভ করল। তারা জগৎকে দিল এক নতুন সভ্যতা। এমন এক ধর্মের প্রচার তারা করল যা আজও পৃথিবীর জীবন্ত ধর্মগুলির মধ্যে মাথা তুলে সগৌরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পশ্চিম মিশর পার হয়ে আরব বিজেতারা আফ্রিকার উত্তর উপকূল বরাবর জীব্রালটার প্রণালী পর্যন্ত চলে আসে; আরও পশ্চিমে স্পেন ভেদ করে মুসলমান সভ্যতা পিরানিজ পর্বত পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পরে আরবেরা ফরাসীদেশের মাঝামাঝি পর্যন্ত এসেছিল। কিন্তু এখানে এসেই তারা থেমে যেতে বাধ্য হল। ৭৩২ খৃষ্টাব্দে পয়তারের যুদ্ধে ফ্রাঙ্করা আরবদের পিরানিজ পর্যন্ত হাটিয়ে দেয়।

কিন্তু রাজনীতিতে পূর্ব অভিজ্ঞতা আরবদের ছিল না; তাই স্পেন থেকে চীন পর্যন্ত বিস্তৃত তাদের বিরাট সাম্রাজ্য অতি দ্রুত ভেঙে পড়ল। কিন্তু সাম্রাজ্যের পতন হলেও মুসলমান সভ্যতা দ্রুতগতিতে সারা জগতে তার প্রভাবের বীজ ছড়িয়ে দেয়। ইসলামের প্রেরণায় চীনের পশ্চিমে সমস্ত জগতে বহু প্রাচীন সংস্কার লোপ পেয়ে নব ভাবের উদয় হয়। এ নতুন চেতনার মূল্য ইতিহাসের দিক থেকে যথেষ্ট। আমরা যে এলজেবরা বা বীজগণিতের অঙ্ক কষি সেই এলজেবরা শব্দটিই এসেছে আরবী ভাষা থেকে। কেমিষ্ট্রি শব্দটিও আরবী ভাষার অন্তর্গত। রোমানরা যে সব গোলমেলে সংখ্যা চিহ্নের ব্যবহার করত সেগুলির স্থানে পরে প্রচলন হয়েছিল সরল আরবী সংখ্যা চিহ্নগুলির।

সার্লেমেন এবং নব ইওরোপ

৮০০ খৃষ্টাব্দের ক্রীসমাস দিবসে সেন্ট পিটারের গির্জায় পোপ যখন মহানুভব চার্লসকে সম্রাটের পদে বরণ করে নিলেন তখন থেকে আরম্ভ হল পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের যুগ। সম্রাট ও পোপ উভয়ই ছিলেন এই প্রসিদ্ধ পবিত্র সাম্রাজ্যের হর্তাকর্তা। অতএব সভ্যতার কেন্দ্রস্থল হিসেবে রোমের পুনরভ্যুদয় ঘটল। রোম ও টিউটনিক শক্তির মিলনে গঠিত এই সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ইওরোপের আধুনিক ইতিহাস আরম্ভ হল। বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতার ফল এই পবিত্র রোম সাম্রাজ্য এবং ইওরোপের ইতিহাসে এর ফল অতি গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষিণ ইওরোপের সংস্কৃতি ও সভ্যতা এবং উত্তর ইওরোপের নবীন কর্মোদ্যম— এই দুই এর সংমিশ্রনে হয়েছিল পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের উৎপত্তি। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর দু'শ বছর ধরে যে অরাজকতা চলেছিল সার্লেমেনের ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্য তার উচ্ছেদ করে আরম্ভ করল এক নতুন ইওরোপ সৃষ্টি করতে। এই নবীন ইওরোপের কেন্দ্রস্থলই ছিল পবিত্র রোম সাম্রাজ্য। পোপ এবং সম্রাটের অধীনে সমস্ত ইওরোপের একতা সাধনই ছিল এই রাজ্যের মূলকথা। পোপ এবং সম্রাটের মধ্যে যে কথাবার্তা হল তার ফলে ঠিক হয়েছিল যে দেশ শাসন এবং রক্ষায় ভার

থাকবে সম্রাটের উপর আর পোপের হাতে থাকবে স্বর্গের চাবিকাঠি।

৮১৪ খৃষ্টাব্দে সার্লেমেনের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙে গেল এবং আরম্ভ হল সামন্ত যুগ। বর্বর জাতিদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের দরুন ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়া থেকেই ইওরোপের বিভিন্ন অংশে স্থানীয় শাসকেরা নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করতেন। তবে এ বিষয়ে তাঁরা যে বিশেষ কৃতকার্য হতেন না তা বলা বাহুল্য। এ রকম অনিশ্চয়তা খুব বেশী দিন চলতে পারে না। তাই ক্রমে আত্মরক্ষার এক নতুন উপায় উদ্ভাবিত হল। একেই বলা হয় সামন্ততন্ত্র। সামন্ততন্ত্রের প্রভাব আজও ইওরোপে রয়েছে। সাধারণ লোক প্রত্যেক জায়গাতেই নিজেকে অসহায় মনে করত বলে সে চাইত তার চেয়ে বেশী শক্তিশালী কোন ধনী ব্যক্তির সাহায্য এবং রক্ষণাবেক্ষন। কিন্তু এই রকম আশ্রয় ও সাহায্য তো শুধু শুধু মিলতে পারে না। তাই ঐ ধনী ব্যক্তির সৈন্যের কায তাকে করতে হত এবং সময় সময় তাকে কর খাজনা প্রভৃতিও দিতে হত। ধনী ব্যক্তিও এই সবের বদলে বিপদের সময় তার ধনসম্পত্তি রক্ষা করবেন বলে অঙ্গীকার করতেন। ধনী ব্যক্তি আবার তাঁর নিজের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য তাঁর চেয়ে বড় কোন জমিদারের সাহায্য একই ভাবে চাইতেন। এইভাবে ক্ষুদ্র থেকে শক্তিশালী সামন্তগণের মধ্যে জীবন, ধনসম্পত্তি এবং দেশ রক্ষার একটা বন্দোবস্ত

হয়ে যেত। শুধু গ্রামগুলি নয়, তখনকার সহর, মঠ, গীর্জা সবই নিজেদের রক্ষা করবার জন্য এমনিভাবে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল। অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই যে ছোট বড়র কাছে আশ্রয়ের জন্য আগে যেত তা নয়; অনেক সময় ধনী ও শক্তিশালী লোকেরা জোর করে দরিদ্রদের দিয়ে সৈন্যের ও চাষের কায করিয়ে নেবার জন্য সামন্তপ্রথার আশ্রয় গ্রহণ করতেন। যাই হোক, কখনও স্বেচ্ছায় কখনও বা বাধ্যতায় এই প্রথা সারা ইওরোপ জুড়ে বসল।

সার্লেমেনের সময় থেকে ইওরোপের ইতিহাসে একবার এক বংশের রাজত্ব, আবার অন্য বংশের রাজত্ব—পুনঃ পুনঃ এ ব্যাপারই আমরা লক্ষ্য করে থাকি। যখনই যে কোন বংশ সাম্রাজ্যের অধিকার পেতেন তখনই একমাত্র চেষ্টা হয়ে দাঁড়াত কী করে ছোট ছোট রাজা, ডিউক, সামন্ত এবং বড় বড় নগরগুলির আধিপত্য পাওয়া যায়। তাছাড়া ফরাসী-ভাষী এবং জার্মানভাষী রাজ্যগুলির মধ্যে শত্রুতা ক্রমশই বেড়ে উঠছিল।

এ যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নর্থম্যানদের ইংলেণ্ড আক্রমণ। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে নর্ম্যাণ্ডির ডিউক উলিয়াম ইংলণ্ডের রাজা হ্যারল্ডকে হারিয়ে দিয়ে ইংলণ্ড অধিকার করে নেন। পরের চার শতাব্দী ধরে ইংরেজদের শত্রুতা এবং মিত্রতা ঘটেছিল প্রধানতঃ ফরাসীদের সঙ্গে।

ধর্মযুদ্ধ

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে সারা ইওরোপ জুড়ে যখন মারামারি কাটাকাটি আর ধ্বংস চলছিল তখন মিশর ও মেসোপোটেমিয়ায় এমন এক সমৃদ্ধিশালী আরব রাজত্ব গড়ে উঠেছিল, সভ্যতায় যার সঙ্গে সেকালের ইওরোপের কোন তুলনাই হয় না। এ রাজত্বে নানাপ্রকার শিল্পকলা ক্রমেই প্রসার লাভ করছিল এবং মানুষ ভয় ও কুসংস্কারে অন্ধ না হয়ে নানা নতুন তত্ত্বের আলোচনায় ছিল উৎসাহী। ইওরোপের এই অন্ধকারের যুগে আরব ও ইহুদী এরিস্টটল পড়ত এবং আলোচনা করত। পাশ্চাত্যদেশে যে বিজ্ঞান ও দর্শনের অবহেলা হচ্ছিল তারা সযত্নে সেগুলির উন্নতি সাধনে রত হয়।

আরব সাম্রাজ্যের উত্তর পূর্বে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত তুর্কীদের বাস ছিল। ক্রমশঃ তারা এত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে যে আরব সাম্রাজ্য তাদের গতিরোধ করতে পারল না। আরব সাম্রাজ্যের পতনই হল এই তুর্কীদের হাতে। তুর্কীরা পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কনষ্টানটিনোপল আক্রমণ করে এবং ১০৭৬ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানদের প্রধান তীর্থ জেরুজেলেম দখল করে নেয়।

বিশ বছর পর—১০৯৫ খৃষ্টাব্দে—খৃষ্টান এবং তুর্কীদের মধ্যে এক প্রচণ্ড ধর্মযুদ্ধের আরম্ভ হয়। বিধর্মীকে পরাস্ত করতে যাতে সকল খৃষ্টান এক হয় তার জন্য খৃষ্টান চার্চ ইওরোপবাসীকে এক আবেদন জানাল। এই ধর্মযুদ্ধের

আসল উদ্দেশ্য ছিল অবিশ্বাসী বিধর্মীদের হাত থেকে খৃষ্টের পবিত্র সমাধির উদ্ধার সাধন। সন্ন্যাসী পিটার নামে একজন লোক মোটা কাপড় পরে, খালি পায়ে, গাধার পিঠে চড়ে এবং কাঁধে একটি মস্তবড় ক্রুশ বহন করে সমস্ত জার্মানী এবং ফ্রান্স ঘুরতে থাকে। পথে ঘাটে, বাজারে, গীর্জায় জন সমাবেশ দেখলেই সে গাধা থেকে নেমে পড়ে বক্তৃতা আরম্ভ করত। নিরীহ খৃষ্টান তীর্থযাত্রীদের উপর তুর্কীদের অত্যাচার এবং বিধর্মীর হাতে পবিত্র সমাধির অধিকার—এই দুটিই ছিল তার আক্ষেপ এবং মূল বক্তব্যের বিষয়। তার প্রচারের ফলে সারা পাশ্চাত্য জগৎ জুড়ে এক তুমুল উত্তেজনা সুরু হল। পৃথিবীতে সাধরণ মানুষের মধ্যে বিপ্লবের এরকম আবির্ভাব এই প্রথম।

দলে দলে লোক ফ্রান্স, রাইনল্যাণ্ড এবং ইউরোপ থেকে নেতৃবিহীন, অস্ত্রবিহীন অবস্থায় চলল পবিত্র সমাধির উদ্ধার সাধনে। এই সব লোকের কিন্তু সৈনিকের শিক্ষা মোটেই ছিল না। এরা ছিল অতি সাধারণ চাষাভুষো শ্রেণীর লোক। এদের দুটি দল হাংগেরীতে প্রবেশ করে নবাগত মজ্যরদের দেখে বিধর্মী তুর্কী বলে ভুল করল। ফলে দুপক্ষ থেকে চলল নানারকম অত্যাচার এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধযাত্রীরা প্রায় সকলেই নিহত হল। আর একটি দল রাইনল্যাণ্ডের ইহুদীদের তুর্কী বলে ভুল করে এবং তাদের অনেককে মেরে ফেলে। পরিশেষে হাংগেরীতে গিয়ে তারা নিজেরাই প্রাণ হারায়। আরও দুটি দল সন্ন্যাসী পিটারের

নেতৃত্বে কনস্টানটিনোপল পর্যন্ত চলে যায় এবং বসফরাস প্রণালীও পার হয়। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করবার আগেই তুর্কীরা তাদের কেটে ফেলে। এমনি করে ধর্মের নামে ইওরোপের প্রথম গণযুদ্ধের আরম্ভ ও শেষ ঘটল।

পর বৎসর, অর্থাৎ ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে আসল যোদ্ধারা বস্‌-ফরাস পার হয়। এই যোদ্ধাদের অধিকাংশই ছিল নর্ম্যাণ। প্রায় এক বৎসর সমস্ত এন্‌টিঅক ঘিরে তাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তারপর, ১০৯৯ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে তারা জেরুজেলেম আক্রমণ করে। একমাস অবরোধ সহ্য করার পর জেরুজেলেম আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। বিজয়ী সৈন্যেরা নগরে ঢুকে যে যুদ্ধ করেছিল তা অতি ভয়ানক। এত রক্তপাত হয়েছিল যে জেরুজেলেমের পথে অশ্বারোহী ভ্রমণকারীরাও নাকি রক্তস্রোতে বাধা পেত। ১৫ই জুলাই রাত্রে আক্রমণ-কারীরা অনবরত যুদ্ধ করতে করতে পবিত্র সমাধির নিকট চলে আসে এবং প্রাণ তুচ্ছ করে সকল বাধা দান অগ্রাহ্য করে।

সমাধির উপর ধর্মযোদ্ধার প্রতিমূর্তি

১১৬৯ খৃষ্টাব্দে মিশরের অধিপতি সালাদীনের নেতৃত্বে মুসলমান সৈন্যেরা আবার একজোট হয়। বিধর্মী খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে সালাদীন পুনরায় জেরুজেলেম

অধিকার করেন। তৃতীয় যুদ্ধে খৃষ্টানেরা কিন্তু মুসলমানদের হাত থেকে তাদের পবিত্র নগর উদ্ধার করতে পারেনি। চতুর্থ ধর্মযুদ্ধে তুর্কীদের কোন ক্ষতি হয় নি বললেই চলে ; এ যুদ্ধ হয়েছিল ল্যাটিন চার্চ ও পূর্ব সাম্রাজ্যের মধ্যে এবং ক্ষতি কিছু হয়েছিল কনস্টানটিনোপল নগরের। আরও কয়েকটি ধর্মযুদ্ধ হয়েছিল ; কিন্তু মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজেলেম নেওয়া সম্ভবপর হয়নি। খৃষ্টানদের এই প্রধান তীর্থস্থানটি বরাবর তুর্কীদের হাতেই ছিল। ১৯১৮ সালে প্রথম মহা-সমরের পর ইংরেজ সেনাপতি এলেনবি তুর্কীদের হাত থেকে জেরুজেলেমের উদ্ধার সাধন করেন। বর্তমানে জেরুজেলেম নব স্থাপিত ইসরায়েল রাজ্যের একটি প্রধান নগর।

দ্বাদশ শতাব্দী ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমাংশ ছিল ইওরোপে পোপ প্রাধান্যের যুগ। পোপের কর্তৃত্বাধীনে এ সময় সমগ্র খৃষ্টান জগতের একত্রে সমাবেশ সম্ভব হয়েছিল। ইওরোপের অধিকাংশ স্থানে খৃষ্টান ধর্মে সহজ ও সরল বিশ্বাস ছিল এ যুগের একটি বিশেষত্ব।

পোপদের কথা বলতে গেলে আমাদের সর্বপ্রথম মনে আসে মহানুভব গ্রেগরীর নাম। তিনিই সেণ্ট অগাষ্টাইনকে ইংলণ্ডে পাঠিয়েছিলেন ইংরেজদের খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করতে। পোপ তৃতীয় লিও সার্লেমেনকে সম্রাটের পদে বরণ করে পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন। সেই হিসেবে ইতিহাস চিরকাল তাঁর নাম স্মরণ করে রাখবে।

একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইওরোপীয় সমাজে হিলডাব্র্যাণ্ড নামে আর একজন যাজক-রাজনীতিজ্ঞের উদয় হয়। বিজেতা উইলিয়ামের তিনি ছিলেন বন্ধু। ইওরোপের পরবর্তী ইতিহাসে ইনি পোপ সপ্তম গ্রেগরী নামেই খ্যাত। তাঁর পরবর্তী আর একজন পোপও ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। প্রথম ধর্মযুদ্ধের পোপ দ্বিতীয় আর্বানের কথা মানুষ নিশ্চয়ই ভুলবে না। বুলগেরিয়া থেকে আয়াল্যাণ্ড, নরওয়ে থেকে সিসিলি এবং জেরুজেলেম পর্যন্ত ছিল পোপের একচ্ছত্র আধ্যাত্মিক আধিপত্য। কোন কোন পোপ কিরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়। পোপ সপ্তম গ্রেগরী সম্রাট ষষ্ঠ হেনরীকে নিজের কৃতকার্যের জন্য অনুশোচনা এবং ক্ষমা ভিক্ষা করতে বাধ্য করান। শুধু তাই নয়, পোপের ক্ষমা লাভের জন্য পরাক্রান্ত সম্রাটকে নগ্নপদে চটবস্ত্র পরিহিত অবস্থায় তিন দিন তিন রাত্রি পোপের দুর্গ-প্রাসাদের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সম্রাট ফেড্রিক বারবোসসাকেও ভেনিস সহরে পোপ দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের পদতলে জানু পেতে বসে অঙ্গীকার করতে হয়েছিল যে তিনি তাঁর আনুগত্য সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করেন। বিভিন্ন নেতার অনুচর হিসেবে চার্চের মধ্যে শ্রেণীভেদও ছিল বিস্তর। বেনিডিকটাইন, ক্লুনিয়াক,

মধ্যযুগের খৃষ্টান ধর্মযাজক

কার্থুসিয়ান, সিস্টারসিয়ান—এঁরা সকলেই ছিলেন রোমান চার্চের অন্তর্গত বিভিন্ন যাজক শ্রেণী।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইওরোপের ধর্মজগতে ফ্রানসিসকান এবং ডমিনিকান নামক দুটি ধর্মসঙ্ঘের বহুল প্রসার আমরা দেখতে পাই। এই দুটি সঙ্ঘের ধর্মভ্রাতারা ছিলেন মঙ্ক বা খৃষ্টান সন্ন্যাসীদের থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এসিসির সেণ্ট ফ্রান্সিস বাক্যে এবং কার্যে খৃষ্টের অনুসরণ করতে সকলকে অনুরোধ করেছিলেন। মানবের সেবা এবং সাধারণের মত দরিদ্র জীবনযাপন এ দুটিই হচ্ছে তাঁর শিক্ষার মূলকথা। ডমিনিকান সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ফ্রান্সিসকানদের চেয়েও গোঁড়া। পোপ তৃতীয় ইনোসেণ্ট প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধতা নিবারণের জন্য এঁদেরই সাহায্য নিয়ে ধর্মাধিকরণের সৃষ্টি করেছিলেন।

অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে খৃষ্টান্ ধর্মের সূক্ষ্মবিচার করবার মত তত্ত্বজ্ঞানীরও অভাব ছিল না। ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইওরোপের ধর্ম-জগতে উইক্লিফের নাম ছিল যথেষ্ট। ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন।

ধর্মের ব্যাপারে ভেদাভেদ, কলহ, অত্যধিক সুযোগ সুবিধার জন্য দাবিদাওয়া ক্রমশঃ চার্চকে দুর্বল করে ফেলে। আগেকার মত চার্চের উপর সরল বিশ্বাস জনসাধারণের আর ছিল না। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে আমরা দেখতে পাই যে পোপের ক্ষমতায় ভাঙন ধরেছে।

ইওরোপের নব জাগরণ

দ্বাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে এমন কতগুলি নিদর্শন মেলে যা থেকে আমরা মনে করে নিতে পারি যে ইওরোপে আবার জ্ঞানের উন্মেষ আরম্ভ হয়ছিল। এতদিন অজ্ঞান অন্ধকারে কাটিয়ে ইওরোপবাসী আবার গ্রীকদের আরব্ধ তত্ত্বানুসন্ধানে মনোনিবেশ করেছিল। ইওরোপে জ্ঞানের এই যে পুনরভ্যুদয়, এর অনেক জটিল কারণ আছে। যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান, প্রাত্যহিক জীবনে সুখ সুবিধার অধিকতর সুযোগ, ধন সম্পত্তি রক্ষার পূর্বাপেক্ষা সুব্যবস্থা এবং ধর্মযুদ্ধের দরুণ ইওরোপবাসীর মনের প্রসার—এগুলি হচ্ছে কয়েকটি কারণ।

ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে ইওরোপে অনেক স্বাধীন ও সমৃদ্ধিশালী নগরের সাক্ষাৎ পাই। ভেনিস, ফ্লোরেন্স, জেনোয়া, লিসবন, প্যারিস, ব্রুজেস, লণ্ডন, এণ্টোয়ার্প, হামবুর্গ, এবং নভগরড তাদের মধ্যে কয়েকটি মাত্র। এই নগরগুলি ছিল বাণিজ্য-প্রধান এবং বহু লোক নানাস্থান থেকে এ সকল জায়গায় জড় হত ও নানা আলাপ আলোচনা করত। এই সব আলোচনার ফলে স্বভাবতই মানুষের মনে চার্চের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জাগত। এক কথায় কোন কিছু মেনে নেবার আগে নানা প্রশ্নের দ্বারা নিজেকে সন্তুষ্ট করবার কৌশল মানুষ আয়ত্ত করতে চেষ্টা করছিল। স্বাধীনভাবে

চিন্তা করার, দেখার এবং বোঝার এই যে শক্তি মনোজগতে ইওরোপের পুনরভ্যুত্থানের এটি একটি বড় কথা।

একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্যারিস, অক্সফোর্ড, প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উন্নতি আরম্ভ হয়েছিল। মধ্যযুগের পণ্ডিতেরা এই সব বিদ্যায়তনে বাক্যের অর্থ এবং বোধ সম্বন্ধে নানা বিচারের দ্বারা বৈজ্ঞানিক যুগের সুস্পষ্ট এবং স্বাধীন চিন্তাকে অনেক পরিমাণে সাহায্য করেছিলেন। রোজার বেকন ছিলেন এ সময়কার সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। ১২১০ থেকে ১২৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন অক্সফোর্ডের ফ্রান্সিসকান শাখার একজন ধর্মযাজক তবু বিজ্ঞান জগতে তিনি যা দিয়ে গেছেন তাতে তাঁকে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মদাতা বললে অত্যুক্তি হয় না। ইওরোপের ইতিহাসে তাঁর স্থান এরিষ্টটলের পরেই।

যে যুগে তিনি বাস করতেন সে যুগে ইওরোপের অবস্থা কী ছিল তা স্পষ্ট করে তিনি তাঁর সমসাময়িক পৃথিবীকে বলেছিলেন। তখনকার দিনে চার্চের ভয়ে বিজ্ঞান সম্বন্ধে সত্য কথা বলতে অনেকেই সাহস করত না, চার্চ যা বলত তা যে ভুল একথা বুঝেও বহু লোক তা মেনে নিত। চার্চের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সত্যকথা বলবার সাহস দেখালে ধর্মদ্রোহিতার শাস্তি পেতে হবে একথা তাদের অজানা ছিল না। এ হেন সময় জন্মগ্রহণ করেও বেকন্ চার্চের সাম্‌নে একথা বলতে কসুর করেন নি যে তাঁর সমসাময়িক জগৎ অজ্ঞান তিমিরে

আচ্ছন্ন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর রচণাগুলি যেন অন্ধকার ইওরোপের উপর ক্ষণিক আলোর রেখাপাত।

আরব সভ্যতা খৃষ্টান জগতকে শুধু দার্শনিক চিন্তা এবং বিজ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ করেনি, জ্ঞানের বহুল প্রচারের জন্য কাগজের ব্যবহারও শিখিয়েছিল। কাগজের সাহায্য না পেলে ইউরোপে জ্ঞানের পুনরুন্মেষ যে ঘটত না তা বলা বাহুল্য। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে ইওরোপে ভাল কাগজ তৈরী হত না। এ বিষয়ে ইটালীই ইওরোপের পথদ্রষ্টা। চতুর্দশ শতাব্দীতে কাগজ প্রস্তুত করবার কৌশল জার্মানীতে পৌছায় এবং এই শতাব্দীর শেষভাগে কাগজ সুলভ হলে মানুষ মুদ্রন কৌশল আয়ত্ত করতে চেষ্টা করে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুদ্রিত পুস্তকের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল।

ছাপা আবিষ্কারের দুটি ফল ইওরোপে খুব শীঘ্রই লক্ষিত হয়। একটি হচ্ছে বাইবেলের বহুল প্রচলন ; অন্যটি বিদ্যালয়ে পঠিত পুস্তকগুলির মূল্য হ্রাস। পড়তে শেখার আগ্রহ অতি দ্রুত গতিতে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীতে বইএর সংখ্যাই যে শুধু বৃদ্ধি পেল তা নয়, ছাপার ফলে বই পড়বার এবং বোঝবার অনেক সুবিধে হল এবং পাঠকের সংখ্যা ক্রমশই লাগল বেড়ে যেতে। পুস্তকের ব্যবহার সাধারণের কাছে আর রহস্য হয়ে রইল না। এমনভাবে বই লেখা হতে লাগল যে জনসাধারণ

সেক্সপিয়র

তা পড়ে এবং দেখে যেন বুঝতে পারে। সেইজন্য ল্যাটিনে না লিখে সাধারণ ভাষায় বই লেখার প্রচলন হতে লাগল। ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাস আমরা পাই চতুর্দ্দশ শতাব্দী থেকেই।

ইওরোপের মনোজগতে যে বিপ্লব এসেছিল তা এত ব্যাপক যে শ্রেণী বিশেষের মধ্যে তা আবদ্ধ থাকতে পারে নি। জ্ঞানের জোয়ার ইওরোপের সমস্ত তট প্লাবিত করে দিয়েছিল এবং সেই প্লাবনে শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ ইওরোপ-বাসী অবগাহন করে পূত এবং পবিত্র হয়ে উঠেছিল যেন।

মুদ্রিত পুস্তকের পাতায় পাতায় ইওরোপের লোকেরা পেল পৃথিবী সম্বন্ধে নতুন ধারণা, নতুন নতুন দেশের নতুন আচার ব্যবহার, নতুন পশুপক্ষী, নতুন বৃক্ষলতার কথা, সৌর-জগতে এবং সমুদ্রপারে নতুন আবিষ্কারের জ্ঞান এবং সমস্ত বিশ্ব ব্যাপে নব নব সম্ভাবনা। ইওরোপীয় মনে জ্ঞান ও জ্ঞান-স্পৃহার এই যে পুনরুন্মেষ ইতিহাসে একেই বলা হয় নবযুগ বা রেণেশাঁস।

ভৌগলিক আবিষ্কারের যুগ।

প্রাচীন যুগে যে সব পর্যটক মোঙ্গল বা তাতার রাজসভা দেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে মার্কো পোলো সর্বপ্রধান। তিনি ছিলেন ভেনিসের লোক। আনুমানিক ১২৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর বাবা আর কাকার সঙ্গে চীন দেশে যান। তাঁর এই ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা-নৈপুণ্যে চিরকাল মানুষকে আনন্দ দেবে।

তাঁরা প্যালেস্টাইনের পথে রওনা হন। তারপর আর-মেনিয়ায় আসেন। সেখান থেকে মেসোপোটেমিয়ার মধ্য দিয়ে পারস্যোপসাগরের তীরে অবস্থিত অর্মায সহরে উপস্থিত হন। এখানে ভারত থেকে আগত অনেক সওদাগরের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়। তারপর উত্তর পারস্যের মধ্য দিয়ে তাঁরা পামীরে আসেন এবং সেখান থেকে হোয়াং হো উপত্যকার ভিতর দিয়ে পিকিংএ উপস্থিত হন। পিকিংএ তখন কুবলাই খাঁ অবস্থান করছিলেন। তিনি বিদেশীদের সাদর অভ্যর্থনা জানান। মার্কোকে দেখে খান খুব সন্তুষ্ট হন। অল্পদিনের মধ্যে মার্কো খুব ভাল করে তাতার ভাষা শিখে ফেলেন।

কুবলাই খাঁ

তাঁকে দায়িত্বপূর্ণ রাজকর্মচারীর পদ দেওয়া হয় এবং খানের দৌত্যকার্যে তিনি অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন। তাঁর পুস্তকে তিনি যে সব বাগান, দ্রাক্ষাকুঞ্জ, শস্যশ্যামল দেশ, চমৎকার সরাইখানা, বৌদ্ধমঠ, বহুমূল্য রেশম-বস্ত্র, সোনা-রূপো, মনি-

মানিক্যের কথা বলেছিলেন, তাতে সত্যই ইওরোপে অত্যন্ত কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল।

তিনি বর্মার সঙ্গে মঙ্গোলিয়ার একটি যুদ্ধের নিপুন বর্ণনা দিয়েছেন। শুধু ব্রহ্মদেশ নয়, জাপান এবং তার সমৃদ্ধির কাহিনীও তাঁর পুস্তকে পাওয়া যায়। ভারতেও তাঁকে চীনের রাজদূত হিসেবে পাঠান হয়েছিল।

দুশ বছর পর মার্কো পোলোর পুস্তকের একজন পাঠক পশ্চিম দিক দিয়ে পৃথিবী ঘুরে চীনে যাবার মৎলব করে-ছিলেন। তিনি হচ্ছেন জেনোয়াবাসী নাবিক ক্রীস্টোফর কলম্বস। কলম্বস কিন্তু কখনও চীনে যেতে পারেন নি ; তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে একটি বাধা পেয়ে আটকে যান। এই বাধাই হচ্ছে আমেরিকা। আমেরিকা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ অদৃষ্টপূর্ব এক বিরাট মহাদেশের অস্তিত্ব প্রকটিত হল।

ভাস্কো-ডা-গামা

আমেরিকা আবিষ্কার ইওরোপের অন্যান্য নাবিকদের মধ্যে প্রচুর উদ্যমের সৃষ্টি করে। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকা ঘুরে ভারতে আসেন ; ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ জাহাজ যবদ্বীপ পর্য্যন্ত চলে যায়। ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে ম্যাগেল্লান নামক একজন নাবিক সেভিল নগর থেকে পাঁচখানি জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। ১৫২২ খৃষ্টাব্দে এদের মধ্যে একখানি সমস্ত পৃথিবী ঘুরে পুনরায় সেভিলে ফিরে

আসে। এই জাহাজই ২৮০ জন যাত্রী নিয়ে সর্বপ্রথম পৃথিবী পরিক্রমায় বের হয়। পথে অনেক যাত্রী মারা যায়। ফিলি-

স্পেনের আরমাডা ইংলণ্ড
আক্রমণে চলেছে

পাইন দ্বীপপুঞ্জে ম্যাগেল্লান নিজেই নিহত হন। তিনি আমেরিকা ঘুরে দক্ষিণে ম্যাগেল্লান প্রণালীর মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন। এর কিছুদিন পর পৃথিবী পর্যটন করেন ব্রিটিশ নাবিক ড্রেক।

তুর্কী ও মোঙ্গলদের বিজয় কাহিনী।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সমস্ত খৃষ্টান জগৎকে যখন পোপের নেতৃত্বাধীনে সঙ্ঘবদ্ধ করবার চেষ্টা চলছিল, সে সময় এসিয়ায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায়। চীনের উত্তর দিকের বাসিন্দা তুর্কীরা হঠাৎ খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তারা এসিয়া বিজয়ের সঙ্কল্প নিয়ে এমন এক অভিযান আরম্ভ করে ইতিহাসে যার তুলনা আজও বিরল। উত্তর চীনবাসী এই তুর্কীদের বলা হত মোঙ্গল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়াতেও তারা ছিল যাযাবর। ঘোড়ায় চড়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ানই ছিল তাদের রীতি। হুনেদের মত তারাও অশ্ব দুগ্ধ এবং অশ্ব-মাংসে জীবন ধারণ করত এবং অশ্বচর্মের তৈরী তাঁবুতে বাস করত। তাদের আসল আড্ডা ছিল মোঙ্গোলিয়ার কারাকোরাম নামক স্থানে।

এই সময় চীনদেশের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল। মোঙ্গল সর্দার চেঙ্গিস খাঁ উত্তর চীন আক্রমণ করে ১২১৪ খৃষ্টাব্দে পিকিং অধিকার করে নেন। তারপর পশ্চিম দিকে ঘুরে তিনি একে একে তুর্কীস্থান, পারস্য, আর্মেনিয়া, উত্তর পশ্চিম ভারতবর্ষ এবং দক্ষিণ রুশিয়ার কিফ্ পর্যন্ত সমস্ত অংশ জয় করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি প্রশান্ত মহাসাগর থেকে নীপার

নদী পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়ে ছিলেন। তাঁর সৈন্যেরা ছিল আশ্চর্যরকম সাহসী ও তৎপর। একটি নতুন চৈনিক আবিষ্কারও তাঁকে খুব সাহায্য করে। এই আবিষ্কারটি হচ্ছে বারুদ। ছোট ছোট গাদা বন্দুকে খানের সৈন্যেরা বারুদের ব্যবহার করত। পশ্চিম এসিয়া জয় করবার পর চেঙ্গিস চীনের বাকী অংশটুকুও জয় করে ফেলেন এবং ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে সমগ্র এসিয়ার মধ্যে দিয়ে রুশিয়ায় অভিযান করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ অভিযানের কথা খুব কমই শোনা যায়।

মোঙ্গলেরা সমগ্র এসিয়া বিজয়ের জন্য তাদের সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তারা রাজধানী নানকিন্ সহ দক্ষিণ চীন অধিকার করে ফেলে। মার্কো পোলোর বন্ধু প্রসিদ্ধ কুবলাই খান ১২৮০ খৃষ্টাব্দে চীন সাম্রাজ্যের সম্রাট নির্বাচিত হন।

চতুর্দশ শতাব্দীতে চেঙ্গিসখাঁর বংশধর তৈমুর লংএর আমলে মোঙ্গল প্রতিপত্তি পুনরায় বেড়ে যায়। পশ্চিম তুর্কীস্থান জয় করে ১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে তৈমুর রাজচক্রবর্তীর উপাধি গ্রহণ করেন। সিরিয়া থেকে দিল্লী পর্যন্ত সমস্ত এসিয়া তাঁর অধিকারে ছিল। মোঙ্গল বিজেতাদের মধ্যে তাঁর মত নিষ্ঠুর এবং বর্বর নেতা খুব কমই ছিলেন। স্বকৃত ধ্বংসের উপর তিনি যে সাম্রাজ্য গড়লেন তাঁর মৃত্যুর পরে তার কোন অস্তিত্বই রইল না। কিন্তু তৈমুরের উদ্যমশীল বংশধর বাবর এক

শিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর ভারত আবার অধিকার করে নেন। বাবরের পৌত্র আকবর ভারতের নানা অংশ জয় করে সে দেশে এক দীর্ঘকালস্থায়ী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সাম্রাজ্যেই প্রসিদ্ধ মুগল সাম্রাজ্য নামে খ্যাত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্লাইভের আগমন পর্যন্ত ভারতে এই সাম্রাজ্যেরই অধিপত্য চলেছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এসিয়ায় যখন তুর্কী আস্ফালন প্রথম আরম্ভ হল তখন তুর্কীজাতির অটোমান নামে একটি শাখা এসিয়া মাইনরে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে। সেখানে নিজেদের ক্ষমতার বিস্তৃতিসাধন করে তারা দার্দা-নেলিস পার হয় এবং ক্রমে ম্যাসিডোনিয়া, সিরিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশ জয় করে। বিখ্যাত কনস্টানটিনোপল নগর তখন ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি স্বাধীন দ্বীপ বিশেষ। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে অটোমান সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ ইওরোপের দিক থেকে বন্দুকের সাহায্যে এই নগরটি আক্রমণ করেন এবং অধিকার করে নেন। এ ব্যাপারে সমস্ত ইওরোপে এক তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। আবার এক ধর্মযুদ্ধ আরম্ভ করবার কথা হয়। কিন্তু ধর্মযুদ্ধের দিন এর আগেই পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে তুর্কী সুলতানেরা বাগদাদ, হাংগেরী, মিশর ও উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ জয় করেন এবং নৌশক্তির সাহায্যে ভূমধ্যসাগরের উপর আধিপত্য বিস্তার

করেন। তুর্কীরা ভিয়েনা প্রায় নিয়ে নিয়েছিল এবং খৃষ্টান সম্রাটের কাছ থেকে কর আদায় করতেও ছাড়ে নি।

তবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে খৃষ্টান ইওরোপের দুটি লাভ হয়। প্রথমটি ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে মস্কৌ নগরীর স্বাধীনতা; দ্বিতীয়টি ইওরোপের একমাত্র মুসলমান রাজ্য স্পেনের পতন। স্পেনের গ্রানাডা রাজ্য ছিল আরব শাসিত। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে রাজা ফার্ডিনেণ্ড ও রাণী ইসাবেলা স্যারাসেনদের হাত থেকে গ্রানাডা অধিকার করে নেন এবং স্পেনে পুনরায় খৃষ্টান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

ইওরোপে ধর্মসংস্কার

চতুর্দশ শতাব্দীতে ইওরোপে এক ভীষণ মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়। মারীভয়, অনশন এবং অরাজকতার ফলে সারা ইওরোপ জুড়ে এক ভয়ানক অশান্তির সৃষ্টি হল। জনসাধারণ—বিশেষ করে চাষাভুষো শ্রেণীর লোক জমিদার ও ধনীদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। এই আন্দোলনের জোর সবচেয়ে বেশী অনুভূত হয়েছিল জার্মাণীতে এবং শেষ পর্যন্ত এই সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনটি পরিবর্তিত হয়েছিল এক ধর্ম আন্দোলনে।

ইতিমধ্যে মুদ্রণকৌশল আবিষ্কৃত হয়ে গিয়েছিল। ছাপা বইএর সাহায্যে এই আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হল্যাণ্ড ও রাইনল্যাণ্ডের লোকেরা ছাপার কাজ বেশ ভালই শিখেছিল। ছাপাখানার বিস্তৃতির ফলে বহুসংখ্যক বাইবেল মুদ্রিত ও বিতরিত হতে লাগল। জনসাধারণের মধ্যে বাইবেল সম্বন্ধে নানা আলোচনাও আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে পড়ল। ইওরোপের শিক্ষিত সমাজে পাঠক এবং ভাবুকের সংখ্যা এর আগে আর এত বাড়েনি। চার্চের মধ্যে যখন ভেদাভেদ আর গলদ খুব বেশী, রাজা-রাজড়ারা যখন চার্চের দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে তার ধনসম্পত্তি

হস্তগত করতে একান্ত ব্যগ্র সেই সময় ইওরোপে এই গণ-আন্দোলন ঘটেছিল।

জার্মাণীতে চার্চের গোড়ামির বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের নেতা ছিলেন মার্টিন লুথার। লুথার গোড়াতে ছিলেন চার্চেরই একজন যাজক; পরে প্রচলিত গোড়ামি এবং কুব্যবস্থায় বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ করেন। চার্চের দুর্নীতি ও অব্যবস্থার সংস্কারকল্পে তিনি প্রচলিত ব্যবস্থাগুলির কঠোর সমালোচনা আরম্ভ করলেন। এই আন্দোলনকে জনপ্রিয় করবার উদ্দেশ্যে তিনি মুদ্রিত পুস্তকের সাহায্য নেন এবং খাঁটি জার্মান ভাষায় বই লিখে দেশের সমস্ত প্রজাসাধারণের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেন। মার্টিন লুথার তাঁর কণ্ঠরোধের চেষ্টা হয়। কিন্তু ছাপাখানা পৃথিবীর অবস্থা বদলে ফেলেছিল। তাছাড়া জার্মান রাজাদের মধ্যে লুথারের প্রকাশ্য ও গুপ্ত বন্ধু এত ছিলেন যে চার্চ তাঁর কোন ক্ষতি করে উঠতে পারি নি। জনসাধারণের মধ্যে চার্চের প্রতি বিশ্বাসের অভাব এবং নব চিন্তাধারার উদয় লক্ষ্য করে জার্মাণীর সামন্ত-রাজেরা রোমের অধীনতাপাশ ত্যাগ করতে উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। এখন তাঁরা নিজেদের জাতীয় ধর্মের পৃষ্ঠপোষক বলে প্রচার করতে লাগলেন। ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, বোহেমিয়া—একের পর এক—রোমান চার্চের আধিপত্য অস্বীকার করল। আজ পর্যন্ত তারা রোমের কর্তৃত্ব থেকে স্বতন্ত্রই রয়েছে।

রোমান চার্চের অধীনতাপাশ ছেদ করে যে সমস্ত জাতীয় চার্চ মাথা তুলে দাঁড়াল, তাদের মধ্যে থেকে কয়েকটি সম্প্রদায় আলাদা হয়ে গেল। এ সকল সম্প্রদায় মানুষ এবং ভগবানের মধ্যে পোপ বা রাজা কারুরই প্রয়োজন বোধ করত না। ইংল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডে এমন কয়েকটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল যারা ইহকাল এবং পরকালের পথপ্রদর্শক হিসেবে একমাত্র বাইবেলকেই মানত। রোমান্ চার্চ ছেড়ে দিয়ে নতুন করে আবার এক জাতীয় চার্চের প্রতিষ্ঠার আবশ্যক আছে বলে তারা মনেই করত না। ইংলণ্ডে এই মতাবলম্বী লোকদের বলা হত নন্‌কনফরমিস্ট।

পোপের কর্তৃত্ব থেকে অধিকাংশ উত্তর ইওরোপের ধর্ম বিচ্ছেদের নামই ইতিহাসে রিফরমেশন বা ধর্মসংস্কার বলে পরিচিত। এই আঘাত ও ক্ষতি রোমান চার্চের মধ্যেও নব-জীবনের সঞ্চার করেছিল। প্রাচীন চার্চের পুনরভ্যুদয়ে একজন স্পেনীয় যুবা সৈনিকের দান অসামান্য। পরে ইনি লয়োলার সেণ্ট ইগনেশিয়াস উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করে-ছিলেন। প্রথম জীবনে নানা উদ্যম করবার পর ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি পুরোহিতের পদ বেছে নেন। যীশুসভা নামে একটি সমিতি স্থাপন করে ধর্ম জীবনে ইনি সৈনিক জীবনের শৃঙ্খলা ও ভ্রাতৃভাব আনতে চেষ্টা করেছিলেন। মানবের সেবা করে যে সব খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক ইতিহাসে নাম রেখে গেছেন— তাদের মধ্যে যেসুট বা যীশুসভার সভ্যেরা অনায়াসেই স্থান

পান। এই সভাই ভারতে, চীনে এবং আমেরিকায় প্রচার করেছিল। সমস্ত ক্যাথলিক জগতের শিক্ষানীতির উন্নতিসাধন যেসুটরাই প্রথমে করেছিলেন; প্রটেষ্টাণ্ট ইওরোপের শিক্ষা প্রচেষ্টার মূলে ছিলেন তাঁরাই।

ইওরোপে হাবসবুর্গ রাজবংশ

পঞ্চম চার্লসের সময় পবিত্র রোমরাজ্যের সমৃদ্ধি চরম অবস্থায় পৌঁছেছিল। ইওরোপের শ্রেষ্ঠ নৃপতিদের মধ্যে চার্লস ছিলেন একজন।

তাঁর বড় হওয়ার মূলে ছিল তাঁর পিতামহ ম্যাক্সিমিলিয়নের চেষ্টা। ম্যাক্সিমিলিয়ন যখন প্রথমে রাজা হন তখন তাঁর রাজ্যের মধ্যে ছিল অষ্ট্রিয়া, ষ্টিরিয়া, এলশেসের কতকটা অংশ এবং আরও কয়েকটি স্থান। বিবাহের দ্বারা তিনি পেলেন হল্যাণ্ড এবং বারগাণ্ডি। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর বারগাণ্ডির অনেক অংশ তাঁর হাতের বাইরে চলে যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হল্যাণ্ডের উপর নিজের আধিপত্য তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। তাঁর পিতা তৃতীয় ফ্রেডরিকের মৃত্যুর পর যখন তিনি নিজে সম্রাট হলেন তখন বিবাহের দ্বারা তিনি পেলেন মিলান। শেষ পর্যন্ত, ফার্ডিনেণ্ড এবং ইজাবেলার কন্যার সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিলেন নিজের রাজ্য আরও বাড়াবার আশায়। ফার্ডিনেণ্ড এবং ইজাবেলার পৃষ্ঠপোষকতাতেই কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। অতএব আমেরিকা আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ফার্ডিনেণ্ড ও ইজাবেলার রাজত্ব স্পেন, সার্ডিনিয়া এবং সিসিলিতেই সীমাবদ্ধ রইল না, ব্রেজিল

পর্যন্ত সমস্ত আমেরিকাতেই বিস্তৃত হল। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চম চার্লস সমস্ত আমেরিকার এবং তুর্কী অনধিকৃত ইওরোপের প্রায় অর্ধেকটার অধিকারী হলেন। তাঁর মাতামহ ফার্ডিনেণ্ডের মৃত্যুর পর স্পেন রাজ্যের তিনিই হলেন রাজা। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে পিতামহ ম্যাক্সিমিলিয়ন মারা গেলে মাত্র বিশ বৎসর বয়সে তিনি সম্রাটের পদে নির্বাচিত হলেন।

পোপ এবং ফরাসীদেশের প্রথম ফ্রানসিস পঞ্চম চার্লসের নির্বাচনে বাধা দেন; কারণ তাঁদের ভয় ছিল একজন লোক এতখানি ক্ষমতা পেলে ইওরোপের অনিষ্ট হতে পারে।

লুথারের আন্দোলনের ফলে জার্মানীতে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সম্রাট হয়েই পঞ্চম চার্লসকে তার সম্মুখীন হতে হল। পূর্ব এবং পশ্চিম থেকে সাম্রাজ্যের উপর আঘাত হওয়াতে রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা উঠল আরও জটিল হয়ে। একদিকে প্রবল প্রতাপান্বিত প্রথম ফ্রানসিস অন্যদিকে পরাক্রান্ত তুর্কী সুলতান দুজনেই চার্লসের নবলব্ধ সমৃদ্ধির দিকে ঈর্ষান্বিত দৃষ্টি ফেলছিলেন।

কিছুদিন পর্যন্ত ইংলণ্ডের অষ্টম হেনরীর সঙ্গে বন্ধুতা রক্ষা করে চার্লস এদের দুজনকেই ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। জার্মানী ও ফ্রান্সের প্রধান যুদ্ধগুলি হয়েছিল উত্তর ইটালীতে। জার্মান সৈন্যেরা ফরাসীদেশ আক্রমণ করে মারস্েলস নিতে পারল না, সুতরাং ইটালীতে তাদের হটে আসতে হল। ইটালীর মিলান নগরটিও তারা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। পরে

প্যাভিয়াতে অনেক দিন তাদের ঘেরাও করে রাখা হয়। অন্যদিকে প্যাভিয়া ঘেরাও করে প্রথম ফ্রান্সিস শেষ পর্যন্ত কৃতকার্য হতে পারলেন না; শেষ কালে তাঁকেই বন্দী করে নিয়ে আসা হল। জার্মান সৈন্যেরা রোমে প্রবেশ করে সহরটিকে ধ্বংস করে ফেলল। দশ বছর ধরে এই সব নিরর্থক যুদ্ধ ইওরোপকে নানা দিক থেকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।

প্রাচীন ইওরোপের যুদ্ধ-রথ

অবশেষে পঞ্চম চার্লস ইটালীতে কৃতকার্য হলেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে প্যাডুয়াতে পোপ তাঁকে সম্রাটের পদে বরণ করে নিলেন। জার্মান রাজাদের মধ্যে পঞ্চম চার্লসই শেষ রোম সম্রাট। সম্রাট হয়েই তিনি ফতোয়া জারি করে জার্মানীতে চার্চের সমস্ত পরিবর্তন বন্ধ করে দিতে চাইলেন। লুথারের বন্ধু জার্মান সামন্তরাজেরা কিন্তু এ আজ্ঞার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। বিরুদ্ধবাদী বলে খৃষ্টান জগতে তাদের নাম হয়ে গেল প্রটেসটেন্ট।

অষ্টম হেনরী ইংলণ্ডের রাজা হয়েই পোপের অনুগ্রহ ভাজন হবার জন্য নাস্তিকতার বিরুদ্ধে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। পোপ খুসী হয়ে তাঁকে ধর্মসংরক্ষক উপাধিতে ভূষিত করলেন। কিন্তু এই সহযোগিতা খুব বেশীদিন চলল না। রাণী ক্যাথারিনকে ত্যাগ করে আন্ বোলিন নামক একজন যুবতীকে বিবাহ করতে মনস্থ করে এবং ইংলণ্ডে চার্চের বিরাট

সম্পত্তি হস্তগত করবার আকাঙ্ক্ষায় হেনরী শেষ পর্যন্ত প্রটেসটেণ্ট রাজাদের দলে যোগ দিলেন। সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্ক এর আগেই প্রটেসটেণ্টদের দল ভারী করেছিল।

১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে লুথারের মৃত্যুর পর জার্মানীতে ধর্মযুদ্ধ আরম্ভ হল। যুদ্ধের বিশেষ বিবরণের আবশ্যক নেই। এটুকু বললেই চলে যে পর বৎসর চার্লস একটা আপোষের চেষ্টা করলেন। কিন্তু মিটমাটের কোন আশাই ছিল না। শীঘ্রই অশান্তির আগুন পুনরায় জ্বলল। সমস্ত জার্মানী জুড়ে আবার দেখা দিল যুদ্ধ বিগ্রহ। ইনসব্রুক থেকে পালিয়ে চার্লস প্রাণে বাঁচলেন। ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে পাসাউএর সন্ধিদ্বারা আপোষের আর একটা চেষ্টা হল। চার্লস এর কিছুদিন পরেই এক খৃষ্টান মঠে গিয়ে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতে আরম্ভ করেন। এখানে ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র ও ভ্রাতার মধ্যে তাঁর সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে যায়। ১৫২০ থেকে ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পঞ্চম চার্লস যতদিন সম্রাট ছিলেন ততদিন এই ছিল সাম্রাজ্যের মোটামুটি ইতিহাস।

মুগল শাসনে ভারতবর্ষ

বাবর ভারতে যে রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার কথা আগেই বলা হয়েছে। ১৫০৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্যলাভ পর্যন্ত এই রাজত্ব চলতে থাকে। এই সুদীর্ঘ যুগ মুগল যুগ নামেই খ্যাত।

বাবর কেবল মাত্র দেশ জয় করেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর বংশধরেরা যেন ভারতেই বসবাস আরম্ভ করে। তিনি একজন সুলেখক বলেও পরিচিত। তাঁর জীবনীতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সব কথা তিনি লিখে গেছেন বিদেশীর চোখ দিয়ে দেখা হলেও তার মধ্যে নতুনত্ব আছে। বাবর লিখেছেন তাঁর দেশের সঙ্গে ভারতের কোন মিল নেই বললেই চলে। তাঁর দেশের মত সুন্দর ফুল এবং বড় ও মিষ্টি তরমুজ ভারতে দেখতে পাওয়া যায় না। তবে এদেশে এত নদী, এত পাহাড়, এত রকমের জীবজন্তু এবং এত বেশী ধনরত্ন রয়েছে যে তা দেখে যে কোন লোকের তাক লেগে যেতে পারে। ভারতের অধিবাসীদের বাবর কিন্তু প্রশংসা করতে পারেন নি। ভারতে আসবার পর মাত্র তিন চার বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে আবার বেশী দিনই কেটেছিল যুদ্ধ করে। সুতরাং ভারতবাসীদের সঙ্গে মেশবার তিনি ভাল করে সুযোগ পাননি বলেই মনে হয়।

১৫৩০ খৃষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন তাঁর ছেলে হুমায়ুন। বাবরের সামরিক শক্তি হুমায়ুনের ছিল না। তাছাড়া তাঁকে অনেকদিন ধরে লড়তে হয়েছিল সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ রাজার সঙ্গে ; এঁর নাম হচ্ছে শের সা। শের সা সাধারণ লোকের ছেলে ছিলেন। কিন্তু বুদ্ধি এবং বীরত্বের পরিচয় দিয়ে ইনি ভারতের অনেকখানি অংশ জয় করে ফেলেন এবং হুমায়ুনের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাধে। যতদিন শের সা বেঁচে ছিলেন ততদিন হুমায়ুন সুবিধে করতে পারেন নি। শের সার রাজত্বের সময় ভারতের যে সব উন্নতি হয়েছিল তার মধ্যে দুটির কথা মাত্র উল্লেখ করব। তিনি সমস্ত উত্তর ভারত জুড়ে এক সুদীর্ঘ এবং প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করেন। পরে এ রাস্তার নামই হয়েছে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। ভারতে ঘোড়ার ডাক সুরু হয় শের সার আমলেই।

একটি প্রাচীন সিংহলীয় নক্সা

হুমায়ুনের পর তাঁর ছেলে আকবর হিন্দুস্থানের বাদশা হলেন। সিংহাসনে আরোহণ করবার সময় তাঁর বয়স ছিল খুবই কম ; মাত্র তের বৎসর। একাধিক্রমে তিনি উনপঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। সুতরাং মুগল বাদশাদের মধ্যে তাঁর রাজত্বই সব চেয়ে মনে রাখবার। নিরক্ষর হলেও আকবর ছিলেন অত্যন্ত চতুর ও মেধাবী। রাজ্যের খুঁটিনাটি সব কিছু তিনি নিজের দখলে রাখতে চাইতেন এবং অনেকটা

রাখতে পারতেনও। যথেচ্ছাচারী হলেও তিনি প্রজাদের মঙ্গলই চাইতেন এবং সে যুগের লোক হিসেবে তাঁকে খুব উদারই বলতে হবে। তাঁর সভায় খৃষ্টান যেসুটদের প্রাধান্য ছিল। একবার একথাও রটে যায় যে তিনি খৃষ্টান হবেন; অবশ্য তিনি সে ধর্ম কোনদিনই গ্রহণ করেন নি।

মুগল সম্রাটদের মধ্যে তাঁর রাজত্ব ছিল সব চেয়ে বড়। উত্তরে কাবুল থেকে দক্ষিণে গোদাবরী নদী এবং পশ্চিমে গুজরাট থেকে পূবে বাংলাদেশ পর্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষই ছিল তাঁর রাজত্বের অন্তর্গত।

তাঁর রাজসভায় কয়েকজন বিশেষ গুণী ব্যক্তির সমাবেশ ছিল। ফইজি এবং আবুল ফজল ছিলেন তাঁর সময়কার নামকরা পণ্ডিত। তাঁরা আকবরের রাজত্বের একখানি চমৎকার বিবরণও লিখে গেছেন। রাজা বীরবল ছিলেন আকবরের সভার সুপ্রসিদ্ধ রসিক; তার নাম ভারতবাসীর কাছে আজও পরিচিত। রাজা টোডরমল সে আমলে জমির বন্দোবস্ত এবং রাজস্ব সম্বন্ধে যে সব নিয়ম কানুন করে গিয়েছিলেন আজও ভারত গবর্ণমেণ্ট তার অনেক কিছু মেনে চলছেন।

আকবর হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদাভেদ করতেন না। তাঁর কয়েকজন বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন হিন্দু। রাজা মানসিংহকে তিনি শুধু সেনাপতির পদ দেন নি, কাবুলের শাসনকর্তার পদেও নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি নিজে একজন

রাজপুত মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর সভাসদদের কেউ হিন্দু বিবাহ করলে তিনি খুব খুসীই হতেন।

তাঁর একমাত্র শত্রু যাঁকে তিনি কিছুতেই বশে আনতে পারেননি তিনি হচ্ছেন রাণা প্রতাপ সিংহ। এই রাজপুত বীর বার বার পরাজিত এবং লাঞ্ছিত হয়েও কিছুতেই আকবরের আনুগত্য স্বীকার করেন নি।

আকবরের মধ্যে আমরা ছুটি বিরুদ্ধগুণের একত্র সমাবেশ দেখতে পাই। তিনি একদিকে ছিলেন সৈনিক, অন্যদিকে ছিলেন ধর্মানুরাগী। যুদ্ধ করতে তিনি ভালবাসতেন; দেশ জয়ের বাসনা শেষ পর্যন্ত তাঁর ছিল উগ্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্ম সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করতে তিনি খুব ভালবাসতেন। খৃষ্টান এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সব কথা তিনি গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে শুনতেন এবং নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আগ্রহ দেখাতেন। মনে হয় সব ধর্মের মধ্যেই যে সত্য নিহিত রয়েছে এ সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন এবং সে জন্য প্রচলিত কোন ধর্মের প্রতিই পক্ষপাত দেখান নি। শেষ জীবনে দীন্ ইলাহী নাম দিয়ে তিনি নিজে এক নতুন ধর্ম তৈরী করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং নিজে হতে চেয়েছিলেন তার নেতা। বিভিন্ন ধর্মের প্রতি অনুরাগের পেছনে তাঁর রাজনৈতিক কূটচাল খানিকটা ছিল বলে মনে করলে বোধ হয় বিশেষ ভুল হবে না।

আগ্রার কাছে ফতেপুর সিক্রী নামক স্থানে আকবর নতুন

করে তাঁর রাজধানী নির্মাণ করেছিলেন। একজন ইংরেজ পর্যটক বলেছেন যে এ সহরটি নাকি তখনকার দিনের লণ্ডনের চেয়েও বড় ছিল। এখানকার মস্‌জিদ এবং বুলান্দ দরওয়াজা আজও ভারতে প্রসিদ্ধ। এ নগরকে বেশীদিন তিনি রাজধানী হিসেবে ব্যবহার করেন নি। কিছুদিন পরে রাজধানী তুলে নিয়ে তাঁকে লাহোরে চলে যেতে হয়েছিল।

প্রসিদ্ধ গায়ক তানসেন ছিলেন আকবরের সমসাময়িক; এ সময়ে তুলসীদাস হিন্দিতে "রামচরিতমানস" রচনা করে চিরকালের জন্য ভারতে নাম রেখে গেছেন।

আকবরের ছেলে জাহাঙ্গীরের অনুরাগ ছিল নানা সুকুমার শিল্পের প্রতি। নানা রকমের ফুল, বাগান, ছবি প্রভৃতি তিনি খুব ভাল বাসতেন। প্রায় প্রতি বছর প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য তিনি যেতেন শ্রীনগরে। সেখানকার সালিমার ও নিশাতবাগ সম্ভবতঃ তাঁরই আদেশ অনুযায়ী তৈরী। জাহাঙ্গীরের প্রধান মহিষী নুরজাহান ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। শুধু সুন্দরী নয়, তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে আসল ক্ষমতা ছিল নুরজাহানের হাতে।

আগ্রার বিখ্যাত ইৎমদ্-উদ্-দৌল্লা জাহাঙ্গীরের রাজত্বের সময় তৈরী। এক তাজমহল ছাড়া সৌন্দর্যে ভারতে এর জুড়ি মেলা ভার। জাহাঙ্গীর ইংরেজ বণিকদের প্রীতির চোখে দেখতেন। সার টমাস রো ইংলণ্ডের রাজসভা থেকে তাঁরই

আমলে ভারতে আসেন এবং সাদরে গৃহীত হন। জাহাঙ্গীরের স্বরচিত জীবনী সুখপাঠ্য।

জাহাঙ্গীরের পুত্র সাজাহানের সঙ্গে সঙ্গে মুগল রাজত্বের পতন সুরু হল। লোক হিসেবে সাজাহান মোটেই ভাল ছিলেন না। ধর্ম বিষয়ে তিনি ছিলেন গোঁড়া। জনসাধারণের উপরে অত্যাচার করতেও তিনি ছাড়তেন না। তাঁর রাজত্বে প্রজাদের দুরবস্থার কথা যখন মনে হয় তখন তাঁর তৈরী তাজমহলও আমাদের আর তেমন আনন্দ দেয় না। সাজাহানের পত্নীপ্রেম যে অসাধারণ ছিল তা তাজমহল প্রতি মুহূর্তে আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে। আর একথা ভুললেও চলবে না যে মুগল স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির অধিকাংশই তাঁর সময় নির্মিত। তাজমহলের অপূর্ব্ব সৌন্দর্যের কথা না তুললেও চলবে। কিন্তু আগ্রার দূর্গ, দিল্লীর দিউয়ান-ই-আম, দিউয়ান-ই-খাস, মতি মসজিদ্, লাল কেল্লা প্রভৃতির তুলনা যে কোন দেশে মেলা ভার।

সাজাহানের পর দিল্লীর সিংহাসনে এলেন তাঁর ছেলে আরঙ্গজেব। মুগলদের মধ্যে ইনিই শেষ প্রসিদ্ধ বাদশা। ইনি আটচল্লিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু এঁর রাজত্বে ক্রমেই মুগল সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এঁর পূর্ব-পুরুষদের বিশেষ কোন গুণই ইনি পান নি। আরঙ্গজেব ছিলেন একজন অতি গোঁড়া মুসলমান। আকবর হিন্দুদের উপর থেকে যে জিজিয়া কর তুলে নিয়েছিলেন ইনি আবার তা

বসিয়ে দিলেন। বহু হিন্দু-মন্দিরও ইনি ধ্বংস করে ফেলেন। ফলে যে সব রাজপুত রাজারা এতদিন মুগল সাম্রাজ্যের উপকার করে আসছিলেন তাঁরা বিরক্ত হয়ে যান। আরঙ্গজেব দক্ষিণে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা এই দুটি রাজ্য জয় করেছিলেন; পূর্বে আসাম জয় করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেন নি। তাঁকে সবচেয়ে নাকাল হতে হয়েছিল চতুর মারাঠী বীর শিবাজীর হাতে। তাঁর দীর্ঘ রাজত্বের অনেকটা সময় কেটে গিয়েছিল মারাঠা শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে। বৃদ্ধ বয়সে আরঙ্গজেব যখন মারা গেলেন মুগল সাম্রাজ্যের তখন একেবারে পড়তি দশা।

এত বড় মুগল সাম্রাজ্য এত দ্রুত ভেঙ্গে পড়ল কেন? এ সাম্রাজ্যের পতনের কারণ খুঁজতে গেলে সকলের আগে মনে পড়ে আরঙ্গজেবের সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক বুদ্ধি। মুগল সাম্রাজ্যকে এতদিন যারা প্রাণ দিয়ে রক্ষা করেছিল সেই শিখ, মারাঠী এবং রাজপুতেরা আরঙ্গজেবের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে শুধু যে দূরে সরে দাঁড়াল তা নয়, সাম্রাজ্যের শত্রুতা সাধনে বদ্ধপরিকর হল। দ্বিতীয়ত, ইংরেজরা ভারতে বাণিজ্য করতে এসে খানিকটা রাজনৈতিক ক্ষমতা পেয়ে গিয়েছিল; মুগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে তারা খুঁটি গেড়ে বসতে চাইল। কোলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে তারা যে সব কুঠি স্থাপন করেছিল তাতে শুধু বাণিজ্যের বিষয় আলোচনা হত না, রাজনীতির মারপ্যাঁচ নিয়ে মাথা ঘামান হত যথেষ্ট।

পর্তুগীজেরা ইংরেজ আসবার আগে থেকেই মুগল সাম্রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ক্রমে ফরাসীরা ভারতে আসায় বিদেশী শক্তিগুলির মধ্যে ভারতকে নিয়ে কাড়াকড়ি পড়ে গেল। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও বলা যেতে পারে। মুগল বাদশাদের যুদ্ধ করবার কৌশল এবং আদব-কায়দা ক্রমে এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল যে যুদ্ধ যুদ্ধের চেয়ে যেন সাম্রাজ্যের একটা জাঁকজমকে পরিণত হতে চলেছিল। বাদশারা যখন যুদ্ধে যেতেন তখন তাঁদের সঙ্গে চলত বহু বেগম ও তাদের দাসীবাঁদী, চলত হাজার রকম খেলা ও আরামের উপকরণ। এক একটা বেশ বড় রকমের বাজারই বাদশার পিছু পিছু চলত বললে ঠিক হয়। এ রকম করে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হলে না থাকে গতি, না থাকে কৌশল। ফলে শেষ পর্যন্ত মুগলেরা বেশীর ভাগ যুদ্ধে সুবিধে করে উঠতে পারে নি।

শোষণ নীতির উপর স্থাপিত বলে এ সাম্রাজ্যের প্রতি সাধারণের কোন প্রাণের টান ছিল না। মুগল সাম্রাজ্য শেষ কালে হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাদশা এবং আমীর ওমরাদেরই সাম্রাজ্য। তার ফলে এই সাম্রাজ্য বাইরে থেকে বিরাট দেখতে হলেও এর প্রাণশক্তি ছিল ক্ষীণ। বহিঃশত্রুর আঘাত পাবার সঙ্গে সঙ্গে এ সাম্রাজ্য তাই তাসের বাড়ির মত ভেঙে পড়ল।

ইওরোপে বিজ্ঞানের নবযুগ

পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ইওরোপীয় জীবনের প্রত্যেক দিকে দেখা দিল নতুন আবিষ্কার এবং নব নব সম্ভাবনা। মানুষের সঙ্গে মানুষের অধিকতর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে উদ্ভব হল নতুন নতুন সমস্যার। মুদ্রিত পুস্তকের প্রচলন, সমুদ্রগামী জাহাজের ব্যবহার এবং কম্পাসের আবিষ্কার দেখিয়ে দিল ইওরোপের ভবিষ্যৎ কোন দিকে। ছাপার সাহায্যে পুস্তকের প্রসার এবং সংবাদের দ্রুত প্রচার সহজ হয়ে এল। কম্পাস এবং নতুন সমুদ্রগামী জাহাজের আবিষ্কার দূরকে, অজানাকে করল নিকট বন্ধু। কিন্তু মোঙ্গলেরা যে বারুদ এবং বন্দুকের সাহায্যে ইওরোপ আক্রমণ করেছিল সেই বারুদ ও বন্দুকের ব্যবহারই আনল ইওরোপের রাজনৈতিক জীবনের সব চেয়ে বড় পরিবর্তন। আগ্নেয়াস্ত্রগুলির সামনে মধ্যযুগের দূর্গ এবং নগর প্রাচীরের আর বিশেষ দাম রইল না। বন্দুক ইওরোপের সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটাল এবং কনষ্টানটিনোপলের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়াল। সুদূর আমেরিকাতে এই নব আবিষ্কারের সাহায্য নিয়েই অতি অল্প সময়ের মধ্যে মেক্সিকো এবং পেরু দখল করা হয়।

রোজার বেকনের কল্পনা ফলপ্রসূ হতে লাগল এই শতাব্দী থেকেই। পোল্যাণ্ডবাসী কোপারনিকাস পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে এই সত্যের প্রচার করে সমস্ত সৌরজগৎকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন। নব পদার্থবিদ্যার জন্মদাতা পিসার গ্যালিলিও কোপারনিকাসের প্রচলিত সত্য অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করলেন। কিন্তু পরে পোপের ভয়ে অন্তরে বিশ্বাস করলেও কোপারনিকাসের তথ্যকে বাইরে থেকে মিথ্যা বলতে বাধ্য হলেন। গ্যালিলিওই প্রথম টেলিস্কোপের আবিষ্কার করেন। গ্যালিলিওর মৃত্যুর বৎসরই ইংলণ্ডে নিউটন জন্মগ্রহণ করেন। বিজ্ঞান জগতে নিউটনের শ্রেষ্ঠ দান মাধ্যাকর্ষনের নিয়ম।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ছাপা এবং কম্পাস আবিষ্কারের ফলে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছিল, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে তেমন কিছু পরিবর্তন আসেনি বটে, কিন্তু মানুষ বিজ্ঞানের মধ্যে যে অসীম সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেয়েছিল তদনুসারে কার্য করে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ক্রমেই একটির পর একটি করে শক্তি তার আয়ত্বাধীনে আসছিল। নতুন দেশ আবিষ্কারের স্পৃহা বেড়েই চলেছিল। ধীরে ধীরে পৃথিবীর মানচিত্রে ট্যাসমেনিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ ফাঁকা জায়গা জুড়ে বসল।

মধ্য যুগে ইওরোপের স্বপ্ন ছিল ক্যাথলিক চার্চের অধীনে রোমের ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে

সে স্বপ্ন কেটে গিয়ে এল ব্যক্তিগত রাজতন্ত্রের কল্পনা। তবে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে সে সময় যে সব দৃশ্য একটির পর একটি এসেছিল তার বিবরণ দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। হল্যাণ্ডের বাণিজ্যনিপুন অধিবাসীরা প্রটেসটেণ্ট হয়ে গিয়ে পঞ্চম চার্লসের পুত্র আর্মাডার অনুষ্ঠানকারী স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপের অধীনতা পাশ ছেদ করে ফেলল এবং দেশে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করল।

ইংলণ্ডে রাজা অষ্টম হেনরী তাঁর মন্ত্রী উলজীর সহায়তায় এবং রাণী এলিজাবেথ তাঁর মন্ত্রী বার্লিগের সাহায্যে ইংলণ্ডে যে স্বেচ্ছাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন কতকটা জনসাধারণের বিরুদ্ধতায় এবং কতকটা স্টুয়ার্ট বংশের নির্বুদ্ধিতার ফলে শেষ পর্যন্ত তার অবসান হল। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে জনগণকে প্রতারিত করবার অপরাধে যখন প্রথম চার্লসকে হত্যা করা হল তখনই বোঝা গেল যে ইংলণ্ডের রাজতন্ত্র মোড় ঘুরেছে। পরের দশ বৎসর নৃপতিহীন ইংলণ্ডে সাধারণতন্ত্রের আধিপত্য চলেছিল।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পর থেকে ইংলণ্ডে আরম্ভ হল পার্লামেণ্টের আধিপত্য এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যুগ। প্রথম জর্জের সময় থেকে আজ পর্যন্ত মন্ত্রীসভাই দেশের শাসন কার্য চালিয়ে আসছেন; অবশ্য মন্ত্রীসভা প্রত্যেক কার্যের কৈফিয়ৎ পার্লামেণ্টকে দিতে বাধ্য। পরে ইংলণ্ডের এই শাসন তন্ত্রের অনুকরণ প্রত্যেক দেশে অল্প বিস্তর হয়েছে।

রাজনীতির দিক থেকে দেখতে গেলে পৃথিবীর শাসনতন্ত্রের এই ঐক্য সামান্য নয়।

কিন্তু এই যুগেই স্বেচ্ছাতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা যদি দেখতে ইচ্ছে হয় তাহলে আমরা তা দেখতে পাব চতুর্দশ লুইএর অধীনস্থ ফরাসী দেশে। সিংহাসনে বসেই তাঁর প্রথম চেষ্টা হয়েছিল কী করে ফরাসী রাজ্যকে রাইন এবং পিরানিজ পর্যন্ত বাড়িয়ে স্পেন-অধিকারভুক্ত নেদারল্যাণ্ড নিয়ে নেওয়া যায়। তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে পঞ্চম চার্লসের মত কোন পৃথিবী জোড়া সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর হওয়া। ঘুষ এবং উৎকোচ তাঁর রাজত্বে যুদ্ধ বিগ্রহের চেয়েও অধিকতর আবশ্যক বলে পরিগণিত হত। গরীব প্রজাদের কর হিসেবে পাওয়া রাজকোষের অর্থ তিনি নিজের স্বার্থের জন্য অকাতরে ব্যয় করতেন। জগৎকে নিজের অর্থ ও ঐশ্বর্য দেখান ছিল তাঁর আর এক মস্ত খেয়াল। ভারসাইয়ে তাঁর সুসজ্জিত উদ্যানশোভিত বিরাট প্রাসাদ সমসাময়িক জগতের ঈর্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইওরোপে রাজতন্ত্রের যুগ

ইওরোপের প্রত্যেক নৃপতিই ক্রমে চতুর্দশ লুইএর আদর্শ অনুকরণ করতে আরম্ভ করলেন। সে যুগে জার্মানী ছিল ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত। জার্মান রাজাদের মধ্যে অনেকেই ভার্সাইএর সমৃদ্ধি ও বিলাসিতার অনুকরণ করে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করতেন। ১৬১৮ থেকে ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মান, সুইড এবং বোহেমিয়ানদের মধ্যে যে যুদ্ধ চলে তাতে জার্মানী অত্যন্ত দূর্বল হয়ে যায়। যুদ্ধ যখন থামল তখন ছোট ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে নানা জোড়াতালি দিয়ে অবতারণা করা হল ওয়েষ্টফ্যালিয়ার সন্ধির। ওয়েষ্টফ্যালিয়ার শান্তির ফলে নতুন করে ইওরোপের যে মানচিত্র রচিত হল তাতে আমরা ছোট ছোট রাজ্য এবং জমিদারীর সমাবেশ দেখতে পাই। তাদের মধ্যে কতগুলি রাজ্যের কিছু অংশ ছিল জার্মান সাম্রাজ্যের মধ্যে এবং কিছু অংশ বাইরে। সুইডেনের খানিকটা জার্মানীর মধ্যে চলে গিয়েছিল অথচ সামান্য ছিটে-ফোঁটা ব্যতীত ফরাসীদেশের কোন অংশ রাইন নদীর কাছাকাছিই পৌঁছাতে পারে নি; এই সব জোড়াতালির মধ্যে প্রুসিয়া একটির পর একটি যুদ্ধ জয় করে ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। প্রুসিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মহানুভব ফ্রেডরিক বার্লিনের নিকট পটসডেম নামক স্থানে তাঁর

ভার্সাই নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে তাঁর সভাসদেরা ফরাসী ভাষায় কথা বলত, ফরাসী বই পড়ত এবং ফরাসী নৃপতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেও ছাড়ত না।

পঞ্চম চার্লস মাত্র একশ বছর আগে যে বিরাট রাজ্য তাঁর উত্তরাধিকারীদের দিয়ে গিয়েছিলেন তার দুর্বলতা ধরা পড়ল ওয়েষ্টফ্যালিয়ার সন্ধিতে। এ সময় থেকে ইওরোপের আধিপত্য হাবসবুর্গ বংশের হাত হতে চলে যায় বুরবোঁদের হাতে। বুরবোঁরা অর্থাৎ চতুর্দশ লুই এবং তাঁর বংশধরেরাই— অতঃপর ইওরোপে পঞ্চম চার্লসের স্থান অধিকার করতে চেষ্টা করেন। আর অষ্ট্রিয়ার যে হাবসবুর্গ বংশ এতদিন পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসে জার্মানী এবং ইটালীর উপর খানিকটা আধিপত্য রেখেছিল প্রুসিয়ার লক্ষ্য হল জার্মানীতে তার স্থান লাভ করবার। হাবসবুর্গদের আর একটি শাখা স্পেন এবং সমুদ্রপারের সাম্রাজ্য উভয়ের উপরেই ক্ষমতা বজায় রেখেছিল।

ওয়েষ্টফ্যালিয়ার শান্তির পর জার্মান সম্রাটদের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বললেই চলে, কিন্তু উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত রাজত্বের জোরে অষ্ট্রিয়ান রাজবংশের ক্ষমতা তখনও অক্ষুণ্ণই ছিল বলতে হবে। সম্রাট ষষ্ঠ চার্লসের কোন ছেলে ছিল না। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মেয়ে সিংহাসনে বসলে যেন কোন গোলযোগ না হয় এ রকম এক প্রতিশ্রুতি তিনি সমসাময়িক রাজাদের কাছ থেকে চান এবং পান।

কিন্তু সে প্রতিশ্রুতির বিশেষ মূল্য ছিল না। কেননা চার্লসের মৃত্যুর পরেই প্রুসিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডারিক অষ্ট্রিয়ার কাছ থেকে সাইলেসিয়া পাবার জন্য দাবি জানালেন এবং ছলে, বলে ও কৌশলে শেষ পর্যন্ত সে প্রদেশটি আত্মসাৎ করলেন। ইংলণ্ডের রাজারা কিন্তু ছিলেন হাবসবুর্গ বংশের বন্ধুলোক। ইংলণ্ড-নৃপতি দ্বিতীয় জর্জ মেরিয়া থেরেসার পক্ষ অবলম্বন করেন। শেষ পর্যন্ত প্রজাদের এবং বিশেষ করে হাঙ্গেরীয়ান্‌দের আনুগত্যের জন্য মেরিয়া থেরেসার রাজ্য অক্ষুণ্ণই রয়ে গেল।

এই সময় আর এক ব্যক্তি নিজেকে পূর্ব সাম্রাজ্যের অধিপতি বলে প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কনস্টানটিনোপলের পতনের পর মস্কোএর গ্র্যাণ্ড ডিউক পরাক্রান্ত আইভান পূর্ব সাম্রাজ্যের সিংহাসনে নিজের দাবি জানালেন। কেবল তাই নয়, সে রাজ্যের রাজচিহ্ন দুমুখো ঈগলপাখী তিনি নিজের বাহুতে ধারণ করলেন। তাঁর পৌত্র দুর্দান্ত আইভান আবার সীজার উপাধি গ্রহণ করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে ইওরোপবাসীরা কিন্তু রুশিয়াকে সুদূর এসিয়ার একটি দেশ বলেই মনে করত। জার পিটারই প্রথম রুশিয়াকে পাশ্চাত্য জগতের গণ্ডীতে আনেন। পিটার্সবুর্গে তিনি নতুন রাজধানী নির্মাণ করেন। রুশিয়া এবং ইওরোপের মধ্যে এ সহরটি খোলা জানালার কায করত। রাজধানী থেকে আঠার মাইল দূর পিটারহফে তিনি তাঁর ভার্সাই তৈরী করলেন। একজন ফরাসী স্থপতি সেখানে তাঁর জন্য বাগান,

কুঞ্জ, ফোয়ারা, ছবির গ্যালারী প্রভৃতি সব কিছুরই আয়োজন করেন। প্রুসিয়ার মত রুশিয়াতেও রাজসভার পোষাকী ভাষা হিসেবে ফরাসীর প্রচলন হল।

অষ্ট্রিয়া, প্রুসিয়া, এবং রুশিয়ার মধ্যে পড়ে ছোট্ট পোল্যাণ্ড দেশটির অবস্থা হয়ে উঠেছিল শোচনীয়। একে সেদেশের শাসন অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না; তাতে আবার সমস্ত দেশটি ছিল কতগুলি ছোট ছোট জমিদারীতে বিভক্ত। ভিতরের গোলমালের চেয়ে কিন্তু বাইরে থেকে বিপদের ভয়ই ছিল বেশী। শেষ পর্যন্ত পোল্যাণ্ডের প্রবল প্রতাপান্বিত প্রতিবেশীরা তাকে খণ্ড খণ্ড করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে ফেলল। ফ্রান্সের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও পোল্যাণ্ডকে একটি অক্ষুণ্ণ স্বাধীন রাজ্য হিসেবে বাঁচিয়ে রাখতে পারা গেল না। এ দুর্দশা তার চলেছিল ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মহাসমর পর্যন্ত। সুইটস্যারল্যাণ্ড এ সময় কতগুলি গণতান্ত্রিক ক্যাণ্টনের সমষ্টি ছিল বললেই চলে। ভেনিসেও সাধারণতন্ত্র চলছিল। জার্মানীর মত ইটালী কিন্তু কতগুলি ছোট রাজ্য এবং জমিদারীতে বিভক্ত ছিল।

মধ্যযুগে সমস্ত ইওরোপ জুড়ে যে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল ধর্মসংস্কারের যুগে তা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায় এবং প্রত্যেক দেশে সম্পুর্ণ স্বাধীন রাজ্য গড়বার হাওয়া বইতে থাকে। এই আবহাওয়া এখনও চলছে—এখনও ইওরোপের স্বাধীন দেশ-গুলি পরস্পরের দিকে ঈর্ষার দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে ছাড়ে না।

এসিয়া, আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়াতে ইওরোপের প্রসার

মধ্য ইওরোপের অবস্থা যখন এমনি জটিল সে সময় পশ্চিম ইওরোপবাসী ডাচ্, স্কেনডিন্যাভিয়ান, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি জাতি সমুদ্রপারের দেশগুলির জন্যে মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ করে। সমুদ্র-গামী জাহাজ ইওরোপের অভিজ্ঞতাকে সমুদ্রের শেষ সীমা পর্যন্ত প্রসারিত করেছিল।

ডাচ্ ও অন্যান্য ইওরোপবাসী সমুদ্রপারের দেশগুলিতে যখন প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে তখন তাদের উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য ও খনিজ দ্রব্যের উদ্ধার। স্পেনের লোকেরাই এ বিষয়ে ছিল অগ্রণী। সমস্ত আমেরিকা জুড়ে তারাই প্রথম সাম্রাজ্য রচনা করে। শীঘ্রই কিন্তু পর্তুগীজেরা তাতে অংশ চেয়ে বসল। পোপ নতুন মহাদেশটি নবাগত দু জাতির মধ্যে ভাগ করে দেন। পর্তুগীজদের ভাগে পড়ল ব্রেজিল ও কেপভার্ডি দ্বীপপুঞ্জের পূর্বে অবস্থিত অধিকাংশ দেশ। আমেরিকার অন্যান্য অংশ গেল স্পেনবাসীদের হাতে।

এ সময় পর্তুগীজরা কেবল আমেরিকায় নয়, অন্যান্য কয়েকটি দেশেও উপস্থিত হয়েছিল। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-

ডা-গামা লণ্ডন থেকে আফ্রিকার তলদেশ ঘুরে জাঞ্জিবারে উপস্থিত হন এবং সেখান থেকে ভারতের কালিকাট বন্দরে এসে পৌঁছান। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ জাহাজ মলাক্কা এবং যবদ্বীপ পর্যন্ত চলে যায়। পর্তুগীজেরা ক্রমে ভারত উপকূলের বহির্বাণিজ্য দখল করে নিতে চেষ্টা করে। এ উদ্দেশ্যে তারা ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী কোন কোন স্থানে বন্দর ও ঘাটি নির্মাণ করেছিল। আফ্রিকায় মোজামবেক্, ভারতে গোয়া, দমন ও দিউ, চীনে ম্যাকাও এবং টিমরের অংশ বিশেষ এখনও পর্তুগালের অধীন।

পোপের আপোষ নিষ্পত্তিতে যে সব জাতি আমেরিকার অংশ থেকে বঞ্চিত হল তারা কিন্তু স্পেন ও পর্তুগালের নবলব্ধ অধিকারকে মোটেই মেনে চলল না। ইংরেজ, ডেন্, সুইড্ এবং পরে ডাচেরা উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও তাদের দাবি নিয়ে ঝগড়াঝাটি আরম্ভ করল। এমন কি পোপের অনুগত ফরাসীদেশের ক্যাথলিক সম্রাটও নির্লজ্জ প্রটেসটেণ্টদের এ কলহে যোগ দিতে লজ্জিত হলেন না। আমেরিকার দাবি দাওয়া নিয়ে ইওরোপেও যুদ্ধ চলল।

শেষ পর্যন্ত ইংরেজরাই সব চেয়ে কৃতকার্য হল। পূবে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলির মধ্যে টিকে ছিল ইংরেজ, ফরাসী এবং ডাচেরা; আর আমেরিকাতে পরস্পর বিরুদ্ধতা করছিল ইংরেজ, ফরাসী এবং স্পেনিশরা। ইংরেজদের সব চেয়ে বড় সুবিধে ছিল এই যে ইংলিশ চ্যানেল ইওরোপের হাত থেকে বরাবর

তাদের দেশকে রক্ষা করে আসছিল। এদিকে স্টুয়ার্টবংশের রাজত্বকালে ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রে নানা গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে ইংরেজদের মধ্যে অনেকেই বাধ্য হয়ে আমেরিকায় নতুন উপনিবেশের সন্ধানে চলে গিয়েছিল। নতুন দেশে এসে তারা শক্ত হয়ে বসল এবং ক্রমশই তাদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। এই সব প্রবাসী ইংরেজদের সাহায্য নিয়েই তাদের দেশবাসীরা আমেরিকায় সফল হয়েছিল।

ভারতে যে ব্রিটিশ কোম্পানী বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছিল, কিছুদিন পরে দেখা গেল, অন্যান্য বিদেশী শক্তিগুলিকে সে দাবিয়ে দিয়েছে। ফরাসী, ডাচ্ ও পর্তুগীজ বাণিজ্য ব্রিটিশ বাণিজ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত হটে গেল। ভারতে সে সময় মুগল রাজত্বের অবসানের যুগ চলছে। কী করে ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ধীরে ধীরে সমস্ত মুগল রাজত্ব করতলগত করল পৃথিবীর ইতিহাসে তা এক অতি আশ্চর্য অধ্যায়।

ফ্রান্স চিরকাল ইওরোপে আধিপত্য বিস্তারের কথা এত বেশী করে ভাবত যে যখন তার প্রতিবেশী ইংলণ্ড সমুদ্রপারের একটির পর একটি দেশ অধিকার করে চলেছিল তখন সে খালি চেষ্টা করছিল কী করে স্পেন, ইটালী ও জার্মানীতে ফরাসী সাম্রাজ্যের প্রসার সম্ভব হবে। অষ্ট্রিয়ার রাণী মেরিয়া থেরেসার রাজ্যপ্রাপ্তিতে যে যুদ্ধের সূচনা হয় তাতে ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার বিপক্ষ অবলম্বন করেছিল। ১৭৫৬ থেকে ১৭৬৩

খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সাত বছরের যুদ্ধে উলিয়াম পিটের কৌশলে ফ্রান্স প্রুসিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকল। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সৈন্য এবং নৌশক্তি ক্যানাডা এবং ভারতে নিজেদের অধিকারের এলাকা বাড়িয়ে চলেছিল। এ ব্যাপার নিয়ে ক্যানাডা এবং ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে নানা কলহেরও সূচনা হয়। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে ডুপ্লে গঠিত শক্তিশালী ফরাসী বাহিনীর সঙ্গে ক্লাইভ পরিচালিত ইংরেজ সেনার সংঘর্ষ বাধে এবং ফরাসীরা পরাজিত হয়। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভ বঙ্গদেশ জয় করেন। তারপর ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করেছিলেন ওয়রেন হেষ্টিংস। আমেরিকায় ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে মণ্টক্যামের হাত থেকে উল্‌ফ কুইবেক দখল করে নেন। শেষ পর্যন্ত ফরাসী উপনিবেশ না হয়ে ক্যানাডা ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হল।

ইতিমধ্যে পূব দিকে প্রতিপত্তি বাড়িয়ে রুশিয়া ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। খানিকটা প্রাচ্য, খানিক পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্পন্ন এই বিরাট রাজ্যের ক্ষমতা-বৃদ্ধি চিরকালই পৃথিবীর ইতিহাসে সুদূর-প্রসারী ফলাফলের সৃষ্টি করেছে। রুশিয়ার প্রসারের কৃতিত্ব সকলের আগে দিতে হয় কসাকদের। এরা রুশিয়ার বন্ধ্যাপ্রান্তরবাসী খৃষ্টান প্রজা। পশ্চিমে এরাই পোল্যাণ্ড এবং হাঙ্গেরীর সামন্ততন্ত্রের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, পূর্বে এরাই তাতারদের ঠেকিয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যেমন আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের পশ্চিমে কতগুলি দুর্দান্ত অধিবাসীর সমাবেশ হয়, ইওরোপের পূর্বেও তেমনি দুর্ধর্ষ কসাকদের উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। রুশিয়ার দস্যুতস্কর, খুনজখমকারী ও নির্বাসিতেরা দক্ষিণের অনুর্বর ভূমিতে এসে বসবাস আরম্ভ করে। ক্রমে তাদের মধ্যে এক সামাজিক জীবন গড়ে ওঠে এবং নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তারা পোল, রুশ ও তাতারদের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করে। ধীরে ধীরে এই কষ্টসহিষ্ণু এবং কর্মঠ সীমান্তবাসীরা রুশিয়ার অন্তর্গত হয়ে পড়ে এবং রুশিয়ার সৈন্যবাহিনীতে নানা কায নিতে থাকে। এসিয়ায় তাদের নতুন বাসভূমিও দেওয়া হয়। সমস্ত সপ্তদশ শতাব্দী ধরে কসাকরা ইওরোপীয় রুশিয়া থেকে পূব দিকে সরে আসতে থাকে। শেষ পর্যন্ত রুশিয়ার পরিধি বাড়তে বাড়তে থামল একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরভূমিতে।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইওরোপে আবার কলহের সূচনা হল ; কিন্তু মধ্যযুগের মত ধর্ম বা রাজনৈতিক ব্যাপার নিয়ে নয়। মুদ্রিত পুস্তক, মানচিত্র এবং সমুদ্রগামী জাহাজের সাহায্যে ইওরোপ পৃথিবীর প্রায় সব সমুদ্রতীর নিজের আয়ত্তাধীনে এনে ফেলেছিল। সমুদ্র গমনের সুযোগ লাভ করে পশ্চিম ইওরোপের বহু অধিবাসী নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় গিয়ে বসবাস আরম্ভ করল। তাছাড়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড ইওরোপের ভবিষ্যৎ উপনিবেশ বলে নির্দ্ধারিত হল।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে কলম্বস প্রথম আমেরিকা আবিষ্কার করেন এবং ভাস্কো-ডা-গামা ভারতে আসেন তা সকল নাবিকের চিরকালের উদ্দেশ্য,—অর্থাৎ বাণিজ্য। কিন্তু প্রাচ্য দেশের অধিবাসীর সংখ্যা প্রথম থেকেই বেশী থাকার দরুণ ইওরোপবাসীদের প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য করেই সন্তুষ্ট থাকতে হল। পূবে তারা আসত ধনী হতে। তারপর টাকাকড়ি জমিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে বিলাসিতার জীবন যাপন করত। কিন্তু আমেরিকাতে ইওরোপের যে সব জাতি প্রথমে আনাগোনা করত তারা দেখল সে দেশটা মোটামুটি

ফাঁকা এবং যা সামান্য আদিম অধিবাসী সেখানে আছে তারা অসভ্য ও বর্বর। অতএব সে দেশে যে সব ধনরত্ন ছিল সেগুলি ইওরোপে নিয়ে আসা হল ইওরোপবাসীদের প্রথম উদ্দেশ্য। সুতরাং ইওরোপ থেকে মানুষ কেবলমাত্র বসবাসের জন্যই আমেরিকায় যেত না, তারা নানা বহু-মূল্য দ্রব্যের অনুসন্ধানেও আমেরিকার বিপদ-সঙ্কুল স্থানগুলি ভ্রমণ করত। দক্ষিণ আমেরিকায় তারা পেল রূপোর খনি; উত্তরে অনুসন্ধান পেল বহুমূল্য পশুলোমের। এই সব দুষ্প্রাপ্য জিনিষের সদ্ব্যবহার করতে হলে কেবল মাত্র আনাগোনা করলেই চলে না, স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে হয়। সুতরাং কেউ কেউ যা পেল নিয়ে ফিরে গেল; অনেকেই কিন্তু ঘরবাড়ি তৈরী করে পাকা হয়ে বসল। ইওরোপের অনেক দেশ থেকেই আবার সময় সময় মানুষ বসবাসের জন্য প্রচুর সুলভ ভূমি পাবে বলেই সমুদ্রপারে গিয়েছিল।

কিছুদিন পরে এই সব প্রবাসীদের জীবনে অনেক নতুন সমস্যা দেখা দিল। ইউরোপ তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে প্রথম থেকেই উপেক্ষা করেছিল। ইউরোপের রাজনীতিবিশারদেরা ভাবতেই পারেননি যে এরা একদিন শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং তাঁদের কাছ থেকে সহানুভূতি এবং সাহায্য প্রত্যাশা করবে। এই সব দেশত্যাগীরা নিজেদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সামাজিক জীবন গড়ে তোলবার

বহু পরেও ইউরোপের রাজ্যগুলি তাদের রাজস্ব আদায়ের উপনিবেশ ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারে নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ফ্রান্স যখন আমেরিকা ত্যাগ করল এবং উত্তর আমেরিকার বার আনা অংশই যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল তখন মেইন ও অণ্টারিও হ্রদের দক্ষিণের তেরটি ব্রিটিশ প্রদেশ জগতের সামনে উপনিবেশ প্রথার কুফলগুলি খুলে ধরল। তারা আরো দেখিয়ে দিল যে কেবলমাত্র কতকগুলি সমুদ্রগামী জাহাজের সাহায্যে সমুদ্রপারবাসী এতগুলি লোককে মাতৃভূমির সঙ্গে এক শাসনতন্ত্রের অধীনে রাখা চলে না।

ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি ছিল নানা ধরণের। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ড ক্রমেই উগ্র রাজতন্ত্রের দিকে বেশী করে ঝুঁকছিল। তৃতীয় জর্জের একগুঁয়ে স্বভাবের ফলেও ইংলণ্ডের সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রগুলির ঝগড়া অনেকটা পাকিয়ে উঠল। অবশেষে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের আরম্ভ হল। প্রথম প্রথম ঔপনিবেশিকেরা সত্যিই মাতৃভূমি সঙ্গে সব সম্বন্ধ একেবারে ত্যাগ করতে চায়নি, পূর্ব দুর্ব্যবহারের জন্য কিছুটা শিক্ষা দিতে চেয়েছিল মাত্র। কিন্তু ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী প্রদেশগুলি এক জাতীয় মহাসভায় মিলিত হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করল। ফরাসী সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই

জর্জ ওয়াশিংটন

করবার সময় জর্জ ওয়াশিংটন যথেষ্ট সামরিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। যুদ্ধ চালাবার জন্য আমেরিকাবাসীরা তাঁকেই নির্বাচিত করল সেনাপতি।

দশ বছর ধরে একটানা যুদ্ধ চলবার পর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে উভয় পক্ষের সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হল। ফলে মেইন থেকে জর্জিয়া পর্যন্ত তেরটি উপনিবেশ স্বায়ত্তশাসন লাভ করে এক যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হল। ক্যানাডা কিন্তু ব্রিটিশ সম্রাজ্যের অধীনে থেকেই সন্তুষ্ট রইল।

স্বাধীনতা যুদ্ধের কিছুদিন পরেই বাষ্পপোত, রেলওয়ে এবং টেলিগ্রাফের আবিষ্কার হল। এইগুলির সাহায্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অধিবাসীবৃন্দ নিজেদের পরিণত করল বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিতে।

বিশ বছর পরে যুক্তরাষ্ট্রের দেখাদেখি আমেরিকার স্পেনিস উপনিবেশগুলিও মাতৃভূমির সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করল। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার চারিদিকে বড় বড় পাহাড়, মরুভূমি ও নিবিড় অরণ্য থাকায় এবং মাঝখানে পর্তুগীজ রাজ্য ব্রেজিল তাদের গতিরোধ করাতে এই উপনিবেশগুলি এক হয়ে একটি বিরাট রাজ্যে পরিণত হতে পারল না। তারা বিভক্ত হয়ে গেল কতগুলি ছোট ছোট সাধারণতন্ত্রে এবং প্রথম প্রথম তাদের মধ্যে বিরোধ আর বিদ্রোহ লেগেই থাকত।

আমেরিকায় নিজের ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতা

লক্ষ্য করে ইংলণ্ড অন্যান্য উপনিবেশগুলিতে ব্রিটিশ পার্লা-মেণ্টের আদর্শে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে আপত্তি করল না। এইভাবে আর এক শতাব্দী ধরে বর্তমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উদ্ভব হল। অবশ্য এখানে মনে রাখতে হবে যে পৃথিবীজোড়া এই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ আমরা দেখছি এর মূলে রয়েছে ব্রিটিশ নৌবল। রাণী এলিজাবেথের সময় থেকে ইংরেজদের নৌশক্তি যদি ক্রমাগত বৃদ্ধি না পেত তাহলে কিছুতেই এই সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব সম্ভব হত না।

ফরাসী বিপ্লব এবং নেপোলিয়ন

ব্যক্তিগত রাজতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা পাই ফরাসী দেশে। ইওরোপের ছোটখাট রাজারা ফ্রান্সকে আদর্শ করে নিজ নিজ ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রয়াস পেতেন। কিন্তু যতই প্রবল হক না কেন ফরাসী রাজশক্তি ছিল অবিচার এবং অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য তার পতন এত দ্রুত, এত শোচনীয় ভাবে হয়েছিল। ফরাসী রাজ-শক্তির বাইরের চাকচিক্য এবং বাহ্যিক প্রতাপ ছিল যথেষ্ট; কিন্তু জনসাধারণকে পীড়ন করতে করতে সে শক্তি অপনাকে আপনি খইয়ে ফেলে। আভিজাত শ্রেণী এবং যাজক সম্প্রদায় কতগুলি বিশেষ আইন দ্বারা করদান থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন। ফলে রাজ্যের সমস্ত চাপ গিয়ে পড়েছিল মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র অধিবাসীদের উপর। করের নিষ্পেষনে দরিদ্র প্রজারা মরিয়া হয়ে উঠেছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধনীদের হাতের কলের পুতুলে পরিণত হয়েছিল। অজস্র অর্থব্যয়ের ফলে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসী রাজতন্ত্রের কোষাগার হয়ে গেল শূণ্য। কী করে টাকা তোলা যায় তার উপায় নির্দ্ধারণের জন্য রাজা বাধ্য হয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের আহ্বান করলেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে অভিজাত, যাজক ও জনসাধারণের মিলিত সভা ষ্টেট্স্

জেনারেল ভার্সাইএ কার্য আরম্ভ করল। ১৬১০ খৃষ্টাব্দের পর একদিনের জন্যও এ সভা আহুত হয় নি। সে সময় থেকে এ পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত কাজ ইচ্ছেমত চালাচ্ছিলেন ফরাসীরাজ।

এই স্বেচ্ছাতন্ত্রের পতন খুব দ্রুতগতিতেই ঘটল। নরকের মত ভয়ানক ব্যাষ্টিল কারাবাসকে প্যারিসের জনসাধারণ আক্রমণ করে লণ্ডভণ্ড করল। সমস্ত ফ্রান্সে আগুনের মত বিদ্রোহ এগুতে লাগল। পূব এবং উত্তর-পূব প্রদেশে অভিজাত শ্রেণীর বিলাস প্রাসাদগুলি চাষীরা পুড়িয়ে ছার-খার করে দিল; সম্পত্তির দলিলপত্রগুলি এমনভাবে নষ্ট করা হল যেন তাদের এক টুকরোও বাতাসে না ওড়ে। সম্পত্তির মালিকদের নির্দয় ভাবে হত্যা করা হতে লাগল। একমাসের মধ্যে অভিজাত শ্রেণী নির্মূল হয়ে গেল বললেও চলে। অভিজাত বংশীয় ভদ্রলোক এবং মাহিলাদের মধ্যে যারা পারলেন দেশ ছেড়ে পালালেন। প্যারিস এবং অন্যান্য বড় সহরগুলিতে নাগরিক শাসন বা কমিউনের ব্যবস্থা হল। নগর রক্ষার জন্য নতুন ধরণের ন্যাশনাল গার্ড বা জাতীয় বাহিনীর সৃষ্টি হল। জাতীয় মহাসভাকে নবযুগের উপযোগী নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করতে হল।

তাছাড়া জাতীয় মহাসভার আদেশ অনুযায়ী সাবেক আমলের সকল প্রকার অবিচারকে অবৈধ ঘোষণা করা হল; রাজকর থেকে অব্যাহতির প্রথা বন্ধ করে দেওয়া হল। দাসত্ব প্রথা, উপাধি এবং শ্রেণী বিশেষের সুযোগ সুবিধে

চিরকালের মত তুলে দেওয়া হল। ব্রিটেনের মত রাজার ক্ষমতা কমিয়ে দেবার চেষ্টাও ফরাসী জাতীয় মহাসভার একদল লোক করতে লাগলেন।

ফরাসী গণ-পরিষদ যা করেছিল তার মধ্যে অনেক কিছুরই যথেষ্ট মূল্য ছিল এবং অনেক কিছু আজও চলছে। আবার কতগুলি ছিল সময়োপযোগী। পরে সেগুলিকে ভেঙে ফেলতে হয়েছে। নব নিযুক্ত শাসন পরিষদ পুরানো শাস্তি ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন করল, বিনা বিচারে জেল এবং যন্ত্রণাবিধি তুলে দিল আর, চার্চের ভয়ে, প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধতাকে শয়তানি বলে মানতে অস্বীকার করল। নর্ম্যান্ডি, বারগণ্ডি প্রভৃতি প্রাচীন প্রদেশগুলিকে মোটামুটি আশীভাগে ভাগ করা হল। যোগ্যতা থাকলে সৈন্যবিভাগের শ্রেষ্ঠ পদগুলি সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর লোকই পাবে বলে ঘোষণা করা হল। চার্চের বিরাট সম্পত্তি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হল। যে সমস্ত ধর্মপ্রতিষ্ঠান শিক্ষা বা দান সংক্রান্ত কোন কায করত না সেগুলি ভেঙে ফেলা হল এবং যাজকগণের বেতন জাতীয় ব্যয় বলে পরিগণিত হল।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে যখন বুঝতে পারা গেল যে রাজা ও রাণী গোপনে তাঁদের প্রবাসী বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে নানারকম মতলব আঁটছেন তখন রাজাকে রাখবার যে সমস্ত আয়োজন চলছিল সবই বাতিল করে দেওয়া হল। অবশেষে কতগুলি বিদেশী সৈন্যকে ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্তে অপেক্ষা করতে বলে

রাজা ও রাণী তাঁদের ছেলেমেয়ে নিয়ে টুইলারিস থেকে পলায়ন করলেন। উদ্দেশ্য ছিল দেশের বাইরে চলে গিয়ে তাঁদের নির্বাসিত বন্ধুদলের সঙ্গে যোগ দেবেন। কিন্তু ভেরেন নামক স্থানে তাঁরা ধরা পড়ে গেলেন। তাঁদের প্যারিসে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল ; এ ব্যাপার নিয়ে ফ্রান্সে এক তুমুল উত্তেজনার বন্যা বয়ে গেল। ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল, অষ্ট্রিয়া এবং প্রুসিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হল ; আর জাতীয় মহাসভা রাজার বিচার করে ফাঁসীর হুকুম দিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ফরাসীরাজকে গিলোটিনের নীচে হত্যা করা হল।

নব্য ফরাসী শাসনতন্ত্রে এক নতুন উদ্দীপনার ভাব এসেছিল। রাজভক্তিসম্পন্ন প্রত্যেক লোককে কঠোর শাস্তি দেওয়া হতে লাগল। ফ্রান্সের বাইরের সকল বিদ্রোহীকে নানাভাবে সাহায্য করা আরম্ভ হল। ফরাসীদেশের লক্ষ্য হল সমস্ত ইওরোপ—সমস্ত পৃথিবীকে গণতন্ত্রে পর্যবসিত করতে। স্বাধীনতা, সমতা এবং ভ্রাতৃভাব এই তিনটি শব্দ হল ফরাসী রাজনীতির মূলকথা। দলে দলে যুবক নবগঠিত সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে আরম্ভ করল। সারা দেশ জুড়ে "মারস্সেল্‌স" নামক দেশপ্রেমের অদ্ভুত গানটি গাওয়া হতে লাগল, এখন পর্যন্ত এ গান শুনলে প্রত্যেক ফরাসীর রক্ত গরম হয়ে ওঠে। এই প্রাণমাতান গান এবং ফরাসী গোলা-গুলির সামনে কোন বিদেশী সৈন্যই এগুতে পারল না। ১৭৯২

খৃষ্টাব্দ শেষ হবার আগেই ফরাসী সৈন্যেরা চতুর্দশ লুইএর হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করে আরও অনেক বেশী এগিয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেকবার তারা বিদেশে গিয়ে তাদের পরাক্রম দেখাত। তারা ব্রুসেলস্ আক্রমণ করেছিল, সেভয় অধিকার করেছিল, মেয়েন্স আক্রমণ করেছিল এবং হল্যাণ্ডের কাছ থেকে শেল্ট কেড়ে নিয়েছিল।

তারপর কিন্তু ফরাসী শাসনতন্ত্র এমন একটি কায করে বসল যার ফল মোটেই শুভ হল না। রাজা লুইকে মেরে ফেলবার পর ইংলণ্ড থেকে ফরাসী প্রতিনিধিকে বের করে দেওয়া হয়। ফ্রান্স এই জন্য খুবই বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এটি হয়েছিল খুবই অবিবেচনার কায। সারা সমুদ্র জুড়ে ইংরেজদের আধিপত্য চলছিল। যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইংরেজ এক হয়ে ফরাসীদের সঙ্গে লড়তে আরম্ভ করল। ফরাসী বিপ্লব যখন আরম্ভ হয় তখন ইংরেজদের অনেকেই কিন্তু ফরাসী জনসাধারণের প্রতি সহানুভুতি দেখিয়েছিলেন ; যুদ্ধ বাধবার পর সে উদার মনোভাব আর রইল না।

ফ্রান্সের ক্ষুধার্ত সৈনিকেরা যখন ছেঁড়া পোষাক পরে "মারস্তেলস" গাইতে গাইতে দেশের জন্য প্রাণ দিচ্ছিল তখন প্যারিসে যে সব কায হচ্ছিল সেগুলিকে সত্যই প্রশংসা করা যায় না। বিপ্লব কিছুদিন চলবার পর তার নেতা হলেন রবেস্‌পিয়ার। তাঁর অধীনে ফরাসীরা রাষ্ট্রবিপ্লবের নাম

করে অনবরত অভিজাতশ্রেণীকে ধ্বংস করে যেতে লাগল। বিপ্লবীদের আদেশ অনুসারে গিলোটিনের সাহায্যে গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলাদের অনবরত কেটে ফেলা হতে লাগল। রাণীকে হত্যা করা হল; একে একে রবেস-পিয়ারের শত্রুদের হত্যা করা হল। তারপর যে সমস্ত নাস্তিক ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করল তাদের হত্যা করা হল। এমনি করে প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক সপ্তাহে গিলোটিন শত শত, সহস্র সহস্র দেহ দ্বিখণ্ডিত করতে আরম্ভ করল। মনে হল রবেসপিয়ারের রাজত্ব বুঝি চলেছে রক্তস্রোতের উপর। শেষ পর্যন্ত রবেসপিয়ারকেই নেতার আসন থেকে নামিয়ে হত্যা করা হল।

বিপ্লবের উদ্দীপনায় ফরাসী সৈন্যেরা হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইটসারল্যাণ্ড, দক্ষিণ জার্মানী, উত্তর ইটালী প্রভৃতি দেশে প্রবেশ করেছিল। সে সকল স্থানে রাজাদের তাড়িয়ে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল। কিন্তু যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ফরাসী সৈন্যেরা এসব করছিল তা বিজিত দেশগুলির ধনরত্ন লুট করতে তাদের বাধা দিল না। পরের ধন আত্মসাৎ করে তারা অন্যায়ভাবে ফ্রান্সের শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করতে চেষ্টা করল। যতই দিন যেতে লাগল ততই দরিদ্র প্রজাদেরকে উৎপীড়ক রাজতন্ত্রের অত্যাচার থেকে মুক্তি দেবার বাসনা যেন ফরাসী সেনার কমে আসছিল। মনে হচ্ছিল নিষ্পেষিত জনগণকে স্বাধীনতা দেবার যে লক্ষ্য নিয়ে ফরাসীদেশে মুক্তি

সংগ্রামের সুরু হয়েছিল বিদেশে বুঝি সে আদর্শ আর রইল না; বুঝি নিজের লাভ এবং ক্ষতির দিকেই ফরাসী সৈন্যের দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে কেন্দ্রীভূত হতে লাগল।

এ সময়ে ফরাসী জাতির মধ্যে এমন এক ব্যক্তির জন্ম হয়েছিল যিনি ইওরোপকে প্রথম শিক্ষা দেন উগ্র জাতীয়তা-বোধ কাকে বলে। ইনিই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নেপোলিয়ন। কয়েক বৎসর ধরে নেপোলিয়ন বিজয়ের পর বিজয় করে চলেন। শেষ পর্যন্ত ইওরোপের জনসাধারণ এবং রাজারা একত্র হয়ে তাঁকে বাধা দেন। তিনি প্রায় সমস্ত ইটালী এবং স্পেনদেশ জয় করেছিলেন, অষ্ট্রিয়া এবং প্রুসিয়াকে হারিয়ে নেপোলিয়ন দিয়েছিলেন এবং রুশিয়ার পশ্চিমের সমগ্র ইওরোপকে দাবিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশের হাত থেকে ইওরোপের নৌবল কেড়ে নেবার ক্ষমতা তাঁর হয়নি এবং সমুদ্রে ইংরেজ নৌসেনাপতি নেলসনের কাছে ট্রাফলগার নামক স্থানে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁকে পরাজিত হতে হয়েছিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে স্পেন তাঁর আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং ওয়েলিংটনের সভাপতিত্বে এক ব্রিটিশবাহিনী ধীরে ধীরে ফরাসী সৈন্যকে সে দিক থেকে সরিয়ে দেয়। ১৮১১ সালে রুশিয়ার জার প্রথম আলেক্‌জাণ্ডারের সঙ্গে নেপো-লিয়নের বিরোধ বাধে। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ছ' লক্ষ সৈন্য নিয়ে তিনি রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। কিন্তু রুশিয়ান

সৈন্যের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং সে দেশের কনকনে ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পেরে নেপোলিয়নের অধিকাংশ সৈন্যই মারা পড়ে এবং তিনি পরাজিত হন। তারপর জার্মানী ও সুইডেনও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে লাইপৎ-সিগের যুদ্ধে ফরাসী সেনা হটে যয়ে এবং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন সিংহাসন ত্যাগ করেন। তাঁকে এলবা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। কিন্তু ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে নষ্ট ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের শেষ চেষ্টা করতে তিনি ফ্রান্সে ফিরে আসেন। ১৮১৫ সালে ওয়াটারলুর যুদ্ধে ব্রিটিশ, বেলজিয়ান, প্রুসিয়ান প্রভৃতি সম্মিলিত জাতিগুলির হাতে তাঁর আবার হার হয়। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের বন্দী হিসেবে তিনি সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই ছোট বইএ সেই অদ্ভুত করিতকর্মা লোকটির জীবনের সব কথা বলে শেষ করা যাবে না। ঐতিহাসিক ফিসার নেপোলিয়নের জীবনীতে লিখেছেন—"যুদ্ধে গৌরব ছিল তাঁর জীবনের প্রথম ও শেষ লক্ষ্য। দিগ্বিজয়ের দ্বারা এই গৌরবের প্রতিষ্ঠা তিনি করতে চেয়েছিলেন। ধ্বংসের দ্বারাই এরূপ বিজয় হতে পারে এমন ধারণা তাঁর ছিল। শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি এবং বিবেচনার অধিকারী হয়েও, ফরাসীদেশে আইন, শাসন-শৃঙ্খলা এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা উন্নতি করা সত্ত্বেও তিনি বর্তমান যুগের গোড়াতে ছিলেন সেই পশুমানবেরই প্রতীক ; মনুষ্য-জীবনের শান্তি এবং সঙ্গতির সঙ্গে তাঁর ছিল চিরকালের বিদ্রোহ।"

ফরাসী বিপ্লবের ফলে যে নব উদ্দীপনার ভাব ইওরোপে এসেছিল নেপোলিয়নের রাজত্বে তা অনেক পরিমাণে নষ্ট হয়ে গেল। ইওরোপে যে লণ্ডভণ্ডের সৃষ্টি নেপোলিয়ন করেছিলেন তার উপর যথাসম্ভব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মিলিত বিজয়ী জাতিগুলির প্রতিনিধিবর্গ ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনায় সমবেত হলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে থেকে ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত—অর্থাৎ ওয়টার্লু'র যুদ্ধের শেষ থেকে ক্রাইমিয়ান যুদ্ধের আরম্ভ পর্যন্ত চল্লিশ বৎসর ভিয়েনায় প্রতিষ্ঠিত শান্তির জের ইওরোপে কোন রকমে বজায় রাখা হয়েছিল।

কিন্তু জনগণ তাদের নবলব্ধ ক্ষমতার কথা ভুলে যায় নি। জার্মানী, ইটালী যেখানেই ফরাসী বিপ্লবের বার্তা পৌঁছেছিল, যেখানেই মানুষ ফরাসী ঈগল দেখেছিল সেখানেই সে বুঝেছিল তার অন্তর্নিহিত শক্তির কথা। উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে ইওরোপের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা দ্বিধাবিভক্ত জার্মানী ও ইটালীর একতাপ্রাপ্তি আর বেলজিয়াম ও গ্রীসে দুটি নব শক্তির জাগরণ। ফরাসী বিপ্লবের পরেই ইওরোপের যে কিছুদিন অধোগতি হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সমস্ত পাশ্চাত্য জগতে উদার-নীতির যে নব প্রেরণা এসেছিল তা ইওরোপবাসীর মনকে শুধু বড় করে নি তাকে অসীম সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছিল।

শিল্প-বিপ্লব

সপ্তদশ শতাব্দী, অষ্টাদশ শতাব্দী এবং উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়াকার কথা। এই তুশ বছর ইওরোপে পাশাপাশি এবং পরপর অনেক কিছু ঘটল। যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনীতির মারপ্যাঁচের কথা ছেড়ে দিয়ে আমরা পৃথিবীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে এ কথা বলছি। সারা অষ্টাদশ শতাব্দী ধরে পদার্থ এবং গতি নিয়ে ইওরোপের বিজ্ঞানী মহলে অনেক সূক্ষ্ম আলোচনা চলে। এই সময় গণিতের উন্নতি, মাইক্রসকোপ ও টেলিসকোপে আতসী কাঁচের ব্যবহার এবং নক্ষত্র বিদ্যার প্রসারও আমরা লক্ষ্য করি।

কিন্তু এ যুগের সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যন্ত্র শিল্পের আগমন এবং পৃথিবীতে শিল্প বিপ্লব। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ট্রেভিথিক ওয়াট-পরিকল্পিত এঞ্জিনকে রেলগাড়ি টানবার কাযে লাগান। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম রেলওয়ে খোলা হয়। ষ্টিফেনসের "রকেট" এঞ্জিন তের টন ওজনের গাড়ি টেনে ঘণ্টায় চুয়াল্লিশ মাইল বেগে চলেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সমস্ত ইওরোপে রেলট্রেন অত্যন্ত সাধারণ হয়ে পড়ে।

সম্ভবতঃ বাষ্পপোতের আবিষ্কার রেল এঞ্জিনের চেয়ে কিছু আগেই হয়েছিল। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ক্লাইড ক্যানেলে 'সারলট

ডানডাস' নামক এক বাষ্পপোত চলেছিল বলে জানা যায়। 'ফিনিক্স' নামক আমেরিকান জাহাজ বাষ্প-চালিত অবস্থায় সমুদ্রে প্রথম চলে। ১৮১৯ সালে 'সাভান্না' নামক বাষ্পীয় অর্ণবপোত এ্যাটলান্টিক সমুদ্র প্রথম পাড়ি দিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত কলের জাহাজ পালের জাহাজের চেয়ে বেশী ভার বইতে পারত না। কিন্তু তারপর থেকে ক্রমাগত গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভার বইবার ক্ষমতারও বৃদ্ধি হতে লাগল। যন্ত্রচালিত বলেই জাহাজের প্রত্যেক যাত্রীকে জানিয়ে দেওয়া সম্ভব হতে লাগল কবে কোন সময় জাহাজ কোন বন্দরে এসে লাগবে। আগে এ্যাটলান্টিক পাড়ি দেবার সময়ের কিছুই ঠিক থাকত না। ১৯১০ সালের পর থেকে দ্রুতগতি জাহাজগুলি এই মহাসমুদ্র পার হতে কখনই পনের দিনের বেশী সময় নেয় নি।

স্থলে ও জলে যখন যানবাহনের এরূপ উন্নতি হচ্ছিল তখন ভোল্টা, গ্যালভানি এবং ফ্যারাডে বৈদ্যুতিক গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফের আবিষ্কার হয়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মাঝে সমুদ্রের নীচে কেবল পাতা হয়েছিল। ফলে পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্তে ক্ষণিকের মধ্যে বার্তাদান সম্ভব হল।

কিন্তু টেলিগ্রাফ ও বাষ্পযানের আবিষ্কারের ফলের চেয়ে আরও অনেক ব্যাপক হল নানা প্রকার ধাতু সম্বন্ধে মানুষের আবিষ্কার ও গবেষণার ফল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে

খনি থেকে কাঠ কয়লার সাহায্যে বিশুদ্ধ লোহা আলাদা করে নেবার কৌশল মানুষ শিখেছিল। এই সব কাঁচা লোহাকে আবশ্যক মত যে কোন আকৃতি দান করে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে আরম্ভ করল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্লাস্ট ফারনেসের ব্যবহার আরম্ভ হয়। কোকের সাহায্যে এই যন্ত্র ক্রমেই অধিকতর কার্যকারী হয়ে উঠছিল। ১৭২৮। সালের কাছাকাছি লোহার পাত তৈরী করবার কৌশল জানা গেল। লোহার রড্ ও শিক্ এবং ন্যাসমিয়ের বাষ্পীয় হাতুড়ির ব্যবহার আরম্ভ হল ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ থেকে।

প্রাচীন পৃথিবী বাষ্পের ব্যবহার জানত না। যতদিন মানুষ লোহার পাত তৈরী করতে শেখেনি ততদিন তার পক্ষে বাষ্প-এঞ্জিন, এমন কি পাম্প করবার সাধারণ এঞ্জিনের, উন্নতি করাও ছিল অতি দুঃসাধ্য। আজ আমরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম এঞ্জিনগুলি দেখে নাক সেঁটকাই। কিন্তু বিজ্ঞানের সাহায্যে তার বেশী কিছু তখন মানুষ সৃষ্টি করতে পারত না। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিসেমার প্রণালী এবং ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ওপেন হার্থ প্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ার পর মানুষ ইচ্ছেমত লোহা এবং ষ্টিল গলিয়ে ছাঁচে ঢালতে পারল। আজ যে কোন লোহার কারখানার ইলেকট্রিক চুল্লীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালে আমরা দেখতে পাব যে কড়ায় যেমন দুধ ফোটে ঠিক তেমনি গলিত লোহার স্রোত একদিক থেকে অন্যদিকে আবশ্যক মত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। লোহাকে ইচ্ছেমত নানা

আকৃতি দিতে শিখেই মানুষ বিশাল লৌহপোত, বড় বড় পুল, ষ্টিলের ফ্রেমের সাহায্যে আকাশভেদী প্রাসাদ প্রভৃতি অনায়াসে তৈরী করতে পারল।

যন্ত্র বিপ্লবের আদিকথা হচ্ছে কাঁচ, পাথর, পাথরের গুঁড়ো, রং এবং নানা ধাতুর উপর মানুষের ক্রমবর্ধমান আধিপত্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রকৃতির উপর যেটুকু ক্ষমতা আমরা পেয়েছি তা অতি সামান্য। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের শক্তির উৎস কোথায় আমরা তা বুঝতে পেরেছি মাত্র, কিন্তু সে শক্তিকে এখনও কাযে লাগাতে পারি নি। আবার বিজ্ঞানের সাহায্যে যে শক্তি আমরা লাভ করছি বা করেছি অনেক সময়ই আমরা করি তার অপব্যবহার।

অন্যান্য যন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের ব্যবহার সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানও বেড়ে চলেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ আমেরিকান বৈজ্ঞানিক টমাস এলভা এডিসনের গবেষণার ফলে মানুষ বিদ্যুতের শক্তিকে কিছু পরিমাণে নিজের আয়ত্বে আনতে পেরেছে। এই নবলব্ধ শক্তির সাহায্যে আজকের সাধারণ মানুষও ভাবছে কী করে বিদ্যুতের দ্বারা ইচ্ছেমত শক্তি, আলো এবং উত্তাপ সৃষ্টি হয়। সরু তামার তারের মধ্য দিয়ে যে শক্তির পরিচালনায় আজ চক্ষের পলকে নানারকম দুরূহ কাজ সম্ভব হচ্ছে তার মধ্যে কত সম্ভাবনার ইঙ্গিত রয়েছে তা ভাবলেও কি আশ্চর্য হতে হয় না?

উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষে এক নতুন ধরণের এঞ্জিনের আগমনে আবিষ্কার জগতে আর এক অধ্যায়ের সুরু হল। এতদিন বাষ্প তৈরী করা হচ্ছিল কয়লা থেকে। এখন এমন এক রকম খনিজ তেলের সহায়তায় বাষ্প তৈরী হতে আরম্ভ হল যার দ্বারা অল্পায়াসে হালকা এঞ্জিন চালানোর খুব সুবিধে হতে পারে। নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে শুধু মোটর গাড়িরই চলাচল আরম্ভ হল না, মানুষ আকাশে ভাসতেও শিখল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ওয়াশিংটনের স্মিথ সোনিয়েন ইন্‌ষ্টিটিউটে অধ্যাপক ল্যাংলি প্রথম বিমান তৈরী করেন। যন্ত্রপাতি খুব ছোট হয়েছিল বলে মানুষ বহনের যোগ্যতা এর ছিল না। মানুষকে নিয়ে আকাশপথে রীতিমত পাড়ি দেবার কায বিমান আরম্ভ করেছিল ১৯০৯ সাল থেকে।

রেলওয়ে, মোটরগাড়ি প্রভৃতির দ্বারা চলাচলের সাহায্য খুবই হয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু টেলিফোন, উড়োজাহাজ এবং বেতারের দ্বারা সংবাদ প্রেরণের যে সুযোগ ঘটেছিল তার কথা আজকের মানুষকে বলে দিতে হয় না।

অন্যান্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীতে কৃষিতত্বেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। এ সময় থেকেই কৃষি-কার্যে রসায়নের ব্যবহার আরম্ভ হয়। রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে একই জমিতে মানুষ আগের চেয়ে চার পাঁচ গুণ বেশী শস্য ফলাতে শিখল।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যে উন্নতি হয়েছিল তা আরও উল্লেখ যোগ্য। ম্যালেরিয়ার কারণ আবিষ্কার, নানা রকম টিকের ব্যবহার, ক্ষততে যেন পচ না ধরে তার জন্য নতুন ওষুধ আবিষ্কার, অস্ত্রোপচারের স্থান অসাড় করে দেবার ব্যবস্থা, রঞ্জন রশ্মি, অতি বেগুনি রশ্মি প্রভৃতি রোগীর জীবনে অভূত-পূর্ব আশার সৃষ্টি করল। এক কথায় উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিজ্ঞানের দ্বারা মানুষ নিজের আয়ু বৃদ্ধি করল, কার্যক্ষমতা বাড়াল এবং পৃথিবীতে অসুখ বিসুখ কমিয়ে দিল।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে মানব জীবনে এমন পরিবর্তন এল যে ইতিহাসে একটি নতুন পর্ব আরম্ভ হল বললে অত্যুক্তি হবে না। যন্ত্র-বিপ্লব হতে জগতে একশ' বছরেরও কিছু বেশী সময় লেগেছে। কিন্তু একশ' বছরে সর্ব বিষয়ে যে উন্নতি হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই।

উনবিংশ শতকের শেষে শিল্প-বিপ্লব আসবার সঙ্গে সঙ্গেই সাধারণ মানুষ বুঝেছিল যে একই শক্তির নানা বিকাশ দিকে দিকে তার জীবনকে নাড়া দিচ্ছে। অবাধ ভ্রমণ ও আলোচনা এবং বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা নব অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল বলেই তার পক্ষে শিল্প-বিপ্লবের মর্মোৎঘাটন সম্ভব হয়েছিল।

আমেরিকার যুক্তরাজ্য

যুক্তরাজ্যের পশ্চিম দিকের প্রসার সম্ভব হয়েছিল প্রথমে বাষ্পপোত এবং পরে রেলপথ দ্বারা।

প্রথম দুশ বছর এদেশের অধিবাসীরা সমুদ্রতীরবর্তী স্থানগুলিতেই বাস করত। ধীরে ধীরে তারা ইণ্ডিয়ানা, কেণ্টাকি প্রভৃতি অঞ্চলে প্রবেশ করতে থাকে। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে আর এক পরিবর্তন এল। এ সময় থেকে নদী তীরের দিকেই অধিবাসীদের ঝোঁক গেল বেশী। এর কারণ অবশ্য বাষ্পপোতের আবিষ্কার। আরও পরে কানসাস ও নেব্রাস্কার দিকে আমরা তাদের গতিবিধি দেখি।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রেলপথ খোলার সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা হু হু করে বেড়ে যেতে থাকে এবং দেশের নানা স্থানে বহু নগর গড়ে ওঠে।

কিন্তু বড় হবার আগে যুক্তরাজ্যকেও আত্মকলহের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছিল। রেলপথ এবং টেলিগ্রাফ আসবার আগেই এ দেশে বিভিন্ন ভাবধারার মধ্য দিয়ে দুটি দলে কলহ বেঁধে যায়। দক্ষিণ দিকের প্রদেশগুলিতে দাসত্ব প্রথা গোড়া থেকেই একটানা ভাবে চলেছিল। কৃষিকার্যে এ অঞ্চলের সমৃদ্ধি ঘটেছিল কাফ্রী দাসদের রক্ত জলকরা পরিশ্রম

থেকে। উত্তর অঞ্চল থেকে কিন্তু দাসত্বপ্রথা উঠে গিয়েছিল। আইনের চোখে এ দিকে সকলেই ছিল স্বাধীন। চিন্তাধারার এই বৈষম্যের দরুণ দুটি দলের মধ্যে যে মনান্তর হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? রেলপথ ও বাষ্পপোতের আগমনে মানুষের সঙ্গে মানুষের সাহচর্য বেড়ে যাওয়াতে দুটি দলের মধ্যে এ প্রভেদ বড়ই বিসদৃশ লাগছিল।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পর সম্পূর্ণ নতুন মনোভাব নিয়ে আমেরিকায় যে একদল অধিবাসীর সৃষ্টি হল যুক্তরাজ্যের গৃহযুদ্ধের নেতা আব্রাহাম লিঙ্কন ছিলেন তাদের একজন। নানা অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যে তাঁর বাল্যকাল কাটে। কিন্তু চেষ্টা, অধ্যবসায় ও সততার সাহায্যে তিনি শুধু বড় হন নি যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ১৮৩৪ সালে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি যুক্তরাজ্যের আইন-পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ তাঁকে এ রাজ্যের সভাপতির পদে বরণ করে নেওয়া হল। এর ফলে দক্ষিণের প্রদেশগুলি কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের বাইরে চলে এসে সম্মিলিতভাবে যুক্তরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। প্রথমে কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের সৈন্যসংখ্যা ছিল খুবই কম, কয়েক হাজার মাত্র। পরে বাড়তে বাড়তে হয়ে উঠল কয়েক লক্ষ। বহু সৈন্যক্ষয় ও উদ্যম বৃথা নষ্ট করে শেষ পর্যন্ত লিঙ্কনের অধিনায়কত্বে কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রেরই জয় হল এবং দাসত্ব প্রথা সমস্ত যুক্তরাজ্য থেকে চিরকালের মত তুলে দেওয়া হল।

যুদ্ধ যখন আরম্ভ হয় তখন প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী স্থানগুলিতে রেলওয়ে খোলা হয় নি। যুদ্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অতি দ্রুতগতিতে যুক্তরাজ্যের সমস্ত পথঘাট, সব গ্রাম এবং নগর রেলযুক্ত হল। ফলে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত, বিভিন্ন সভ্যতায় লালিত আমেরিকার অধিবাসীরা এক ভাষায় কথা কইতে, এক ধারায় চিন্তা করতে এবং এক সঙ্গে কাজ করতে শিখেছে।

নবীন জার্মানী ও নব ইটালী

ফরাসী বিপ্লব এবং নেপোলিয়নের দিগ্বিজয় প্রচেষ্টা ইওরোপকে কিছুদিন প্রবলভাবে নাড়া দেবার পর, রাজনৈতিক আবহাওয়া পুনরায় অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এল। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি শিল্প-বিপ্লবের আগমনে ইওরোপের রাজনৈতিক মহলে তেমন কোন চাঞ্চল্য ঘটেনি। কিন্তু যন্ত্র-বিপ্লবের ফলে নাগরিক জীবন ওলটপালট হয়ে যাওয়াতে সামাজিক ব্যবস্থায় গোলযোগ ঘটেছিল। ফরাসী দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের বিপ্লবের পর ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে আবার বিপ্লব দেখা দেয়। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রথমে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সভাপতি নির্বাচিত হন; পরে—১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন।

দান্তে

তৃতীয় নেপোলিয়ন প্যারিস নতুন করে গড়তে সুরু করেন। তাঁর হাতে পড়ে সপ্তদশ শতাব্দীর অস্বাস্থ্যকর সহর থেকে প্যারিস বর্তমানকালের মর্মরশোভিত বিরাট নগরে পরিবর্তিত হয়েছে। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দী ধরে যে যুদ্ধবিগ্রহ ইওরোপের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলিকে ব্যস্ত

রেখেছিল তৃতীয় নেপোলিয়ন পুনরায় সেগুলিতে ইন্ধন যোগাতে চেষ্টা করেন। রুশ সম্রাট জার প্রথম নিকোলাস প্রবল ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে ক্রমেই তুর্কী সাম্রাজ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর লুব্ধ-দৃষ্টি ছিল কনস্টান্টিনোপলের উপর। তুর্কীরাজ্যের খৃষ্টান শ্লাভ প্রজারাও জারকে মুক্তিদাতা বলে ধরে নিয়ে তাঁর সাহায্য প্রত্যাশা করছিল।

কিছুদিন পর ইওরোপে কতগুলি যুদ্ধ আরম্ভ হল। ক্রাইমিয়ান সমরে রুশিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও সার্ডিনিয়া তুর্কীকে সাহায্য করল। বিসমার্কের অধিনায়কত্বে প্রুসিয়া অষ্ট্রিয়ার হাত থেকে জার্মানীর নেতৃত্ব কেড়ে নিল। সেভয় ছেড়ে দিয়েও ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার অত্যাচার থেকে উত্তর ইটালীকে মুক্ত করতে দ্বিধা করল না। ক্যাভুর, মাৎসিনি ও বীর গ্যারিবল্ডীর একান্ত প্রচেষ্টার ফলে ইটালীর খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে বর্তমান ইটালীর সৃষ্টি করল।

যুক্তরাজ্যে যখন গৃহযুদ্ধ চলছিল সে সময় তৃতীয় নেপোলিয়ন কাণ্ডজ্ঞানের যথেষ্ট অভাব দেখিয়ে মেক্সিকোতে নিজের প্রভাব বাড়াতে চেষ্টা করেন। ম্যাক্সিমিলিয়ন নামক এক ব্যক্তিকে সে দেশের সম্রাট নিযুক্ত করে তিনি তার পশ্চাতে রইলেন ফরাসী শক্তির প্রতীক হয়ে। কিন্তু যুক্তরাজ্যের জয় হবার পর মেক্সিকোবাসীরা যখন ম্যাক্সিমিলিয়নকে খুন করে ফেলল তখন তিনি তার সাহায্যের জন্য এগুতেই সাহস পেলেন না।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইওরোপের অধিপত্য নিয়ে ফ্রান্স এবং

প্রুসিয়ার মধ্যে দীর্ঘকালস্থায়ী এক যুদ্ধ বাধে। প্রুসিয়া বহুদিন থেকেই বুঝতে পেরেছিল এরূপ যুদ্ধ বাধবে। সুতরাং সে অনেকটা প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু নানা গোলযোগ এবং আর্থিক দুর্দশার জন্য ফরাসীদেশের অবস্থা এ সময় খুব ভাল ছিল না। আগষ্ট মাসে জার্মানরা ফ্রান্স আক্রমণ করে। সেপ্টেম্বর মাসে সিডেন নামক স্থানে মস্ত একদল ফরাসী সেনা সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের নেতৃত্বে আত্মসমর্পণ করে। অক্টোবর মাসে আর একদল ফরাসী সৈন্য মেৎসে পরাজয় স্বীকার করল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জার্মানরা রাজধানী অবরোধ করে অনবরত গোলাগুলি চালায়। ফলে প্যারিসের পতন হল। ফ্রাঙ্কফোর্টের সন্ধি অনুসারে ফ্রান্স জার্মানীকে এলসেস ও লরেন এই দুটি প্রদেশ দিয়ে দিতে বাধ্য হল। অষ্ট্রিয়া ব্যতীত জার্মানীর অন্যান্য প্রদেশগুলি একত্রে সঙ্ঘবদ্ধ হল এবং প্রুসিয়ার রাজা হলেন জার্মান-সম্রাট।

এইভাবে, ১৮১৫ থেকে ১৮৭১ সালের মধ্যে ইটালী এবং জার্মানীর একতা সম্ভব হয়েছিল।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দ থেকে জার্মানী ও ইটালীর দুই নতুন জাতি ইওরোপের মানচিত্রে সগৌরবে তাদের আয়াসলব্ধ স্থান গ্রহণ করল। পরবর্তী তেতাল্লিশ বছর ইওরোপ মহাদেশের প্রধান শক্তি ছিল জার্মানী। ১৮৭৭-৭৮ সালে রুশিয়া এবং তুর্কীর মধ্যে একটি যুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তারপর ১৯১৪ পর্যন্ত ইওরোপ সীমান্তের আর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি।

সমুদ্রপারে ইওরোপের প্রভাব

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রপারের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বলতে কী বোঝা যেত ভাবা যাক। উত্তর আমেরিকায় বর্তমান ক্যানাডার খানিকটা ইংরেজদের অধীনে ছিল। ভারতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দৌলতে ইংরেজদের অধিকারে এসেছিল। আফ্রিকাতে ইংরেজদের রাজ্য ছিল কাফ্রী ও ডাচ অধ্যুষিত উত্তমাশা অন্তরীপ সংলগ্ন প্রদেশ এবং পশ্চিম আফ্রিকার সমুদ্রতীরবর্তী কয়েকটি বন্দর। তাছাড়া, জিব্রালটার পাহাড়, মল্টাদ্বীপ, জামাইকা, পশ্চিম ভারত দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি কাফ্রী উপনিবেশ, ব্রিটিশ গিয়ানা এবং অষ্ট্রেলিয়ার ও ট্যাসমেনিয়ার কয়েকটি অঞ্চলও ইংরেজদের অধীনে ছিল।

কিউবা দ্বীপ এবং ফিলিপাইনের অন্তর্গত কয়েকটি দ্বীপপুঞ্জ ছিল স্পেন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। পর্তুগাল আফ্রিকাতে তার প্রাচীন গৌরবের ছিটেফোটা সযত্নে রক্ষা করছিল। পূর্বভারত দ্বীপপুঞ্জ ও গিয়ানাদ্বীপে ডাচ-অধিকৃত অংশ কিছু কিছু ছিল। ডেনমার্কের অধিকারে ছিল পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত কয়েকটি দ্বীপ। পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং গিয়ানাদ্বীপে ফরাসী অধিকারভুক্ত স্থানও

ছিল। ইংলণ্ড ছাড়া অন্যান্য ইওরোপীয় শক্তি যা পেয়েছিল তাই নিয়েই চুপ করে বসেছিল; সমুদ্রপারের সাম্রাজ্য বাড়াবার জন্য প্রথম থেকেই তারা বিশেষ সচেষ্ট হয় নি। ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিন্তু ক্রমেই ইংরেজ আধিপত্য বাড়িয়ে চলবার চেষ্টা করছিল।

রেলওয়ে এবং বাষ্পপোত আসার আগে ভারতে ইংরেজ অধিকার ছাড়া সমুদ্রপারের অন্য কোন দেশে ইওরোপীয় শক্তি বড় একটা প্রসারিত হয় নি। ইংরেজদের মধ্যে কেউ কেউ এমন কথা ভাবতেন যে সমুদ্রপারের উপনিবেশ কালে ব্রিটেনের দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অষ্ট্রেলিয়ায় ব্রিটিশ উপনিবেশ ১৮৪২ সাল পর্যন্ত অতি ধীরে গড়ে উঠছিল। তারপর সে দেশে তামা এবং সোনার খনির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড থেকে বহু লোক সেখানে যেতে আরম্ভ করে। চলাচলের সুবিধের জন্য ক্রমে অষ্ট্রেলিয়ার পশম ইওরোপের এক বিশেষ প্রিয় এবং প্রয়োজনীয় বস্তু হয়ে দাঁড়াল। ১৮৪৯ সন পর্যন্ত ক্যানাডারও বিশেষ কোন উন্নতি হয় নি। সেখানে ইংরেজ ও ফরাসী অধিবাসীদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া ও বিদ্রোহ লেগে থাকত। ১৮৬৭ সালের নতুন শাসন সংস্কার হবার পর ক্যানাডার দ্রুত উন্নতি আরম্ভ হল। রেললাইন পাতা হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যানাডাবাসীর জীবনের ধারাই গেল বদলে। রেলপথের সাহায্য নিয়ে ক্যানাডাও যুক্তরাজ্যের মত নিজেকে ধীরে ধীরে পশ্চিমদিকে

প্রসারিত করতে থাকে। বাষ্পপোতের সাহায্যে ক্রমশই ক্যানাডার গম ইওরোপের চাহিদা মেটাতে আরম্ভ করল। এক কথায় বলতে গেলে রেলপথ, ষ্টীমার এবং টেলিগ্রাফ ঔপনিবেশিক সমৃদ্ধির একটি নতুন অধ্যায় রচনা করল।

১৮৪০ সালের পূর্বেই নিউজিল্যাণ্ডে ইংরেজদের কেউ কেউ গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেছিল। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপপুঞ্জকে সর্বতোভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হল।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের পর থেকে জার্মানী, ফ্রান্স এবং ইটালীও কাঁচামালের আশায় ইতস্ততঃ বিশেষ করে আফ্রিকার দিকে লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। অতএব আমেরিকা ছাড়া অন্য সকল মহাদেশেই উপনিবেশের লোভে আবার কলহ দেখা দিল। আমেরিকাতে যুক্তরাজ্যের সভাপতি মনরো ১৮২০ সালে এক ঘোষণায় বলেছিলেন যে নতুন দেশ অধিকার করতে ইওরোপের কোন জাতি যদি আমেরিকাতে পা দেয় তাহলে যুক্তরাজ্য তা শত্রুতা বলে ধরে নেবে এবং সে সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা করতে ত্রুটি করবে না। এই ঘোষণার ফলে সাম্রাজ্যলোভী ইওরোপীয়দের আমেরিকা গমন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ; কিন্তু স্বার্থের জন্য তারা এসিয়া এবং আফ্রিকার নানা অংশ বিধ্বস্ত করতে ছাড়েনি। দুঃখের বিষয় নিজেদের অধিকার জাহির করতে একান্ত ব্যস্ত হলেও বিজিত সাম্রাজ্যের দরিদ্র ও অশিক্ষিত অধিবাসীদের উন্নতি সাধনে কোন ইওরোপীয় শক্তিকেই কিছুমাত্র তৎপর দেখা যায় নি।

ইওরোপের প্রায় লাগালাগি হচ্ছে আফ্রিকা। ১৮৫০ সাল পর্যন্ত এই কালা আদমীদের দেশের অধিকাংশই ছিল ইওরোপবাসীদের কাছে রহস্যময়। একমাত্র মিশর ও সমুদ্র তীরের কয়েকটি স্থান তারা চিনত। কী করে বহু আবিষ্কারক এবং পর্যটকেরা নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে এই কাল যবনিকা ভেদ করেছিলেন তা বলা এখানে সম্ভব নয়। এ বিষয়ে লিভিংষ্টোন প্রভৃতির নাম মানুষ চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। কিন্তু সমস্ত আফ্রিকা মহাদেশ যখন আবিষ্কৃত হল তখন পৃথিবীর সামনে দেখা দিল এক সম্পূর্ণ নতুন জগৎ। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আফ্রিকার সমস্ত অংশ আবিষ্কৃত হল এবং সম্পূর্ণ মহাদেশের মানচিত্র প্রস্তুত হয়ে গেল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই এই বিরাট ভূখণ্ড ইওরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়।

পৃথিবীব্যাপী বিরাট ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয়। স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্ত ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া থেকে আরম্ভ করে অতি প্রাচীনপন্থী অনুন্নত দেশও এর মধ্যে রয়েছে। ভারতের মত এমন বিশাল শক্তিশালী দেশ কোন কালে কোন ইওরোপীয় জাতিরই অধিকারে আসে নি।

ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষ

রাণী এলিজাবেথের আমলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন ভারতে বাণিজ্য করবার অনুমতি পেল সেই থেকে ইংরেজের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আরম্ভ হল। আগেই বলা হয়েছে ইংরেজ ছাড়া যে সমস্ত ইওরোপীয় জাতি ভারতে বাণিজ্য করতে আসত তাদের মধ্যে ফরাসীরা হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রধান। সুতরাং ভারতে ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বী হল ফরাসীরা। ক্লাইভের অধীনে ইংরেজ এবং ডুপ্লের অধীনে ফরাসী অনবরত পরস্পরকে যুদ্ধ এবং কূটনীতির প্যাঁচে ফেলতে চেষ্টা করতে লাগল। ডুপ্লে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে যে রকম সাহায্য এবং উৎসাহ আশা করেছিলেন তা পেলেন না; সুতরাং ফরাসীরা ক্রমেই হটে যেতে লাগল। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বিদেশী জাতিগুলির মধ্যে শেষ পর্যন্ত ইংরেজরাই দাঁড়িয়ে রইল। ক্লাইভের ব্যবহারে এবং ইংরেজদের অত্যাচারে বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লা বেশ বিরক্ত হয়ে ওঠেন; শেষ পর্যন্ত নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে ওঠে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ ক্ষেত্রে মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকাতায় সিরাজদৌল্লা ইংরেজদের কাছে সম্পূর্ণ হেরে গেলেন এবং ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল আরম্ভ হল।

ইংরেজরা ধীরে ধীরে এগুতে আরম্ভ করল। ভারতে এ সময়, তাদের প্রধান শত্রু ছিলেন হায়দার আলির পুত্র মহীশুরের টিপু সুলতান। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইনি সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হন। অন্যদিকে মারাঠারা কিন্তু যুদ্ধের পর যুদ্ধ করে ব্রিটিশদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। মাধোজী সিন্ধিয়া এবং নানা ফারনবিশের মৃত্যুর পর মারাঠা শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের কাছে মারাঠারা শেষবারের মত হেরে যায়। মারাঠাদের কথা বলতে গেলে ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাইএর কথা ভোলা চলে না। সে যুগের মারামারি কাটাকাটির মধ্যে তিনি ত্রিশ বৎসর তাঁর রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রজাদের হিতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে তিনি যে খ্যাতি অর্জন করে গেছেন ভারতের ইতিহাসে তা তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

নেপাল, বর্মা এবং আফগানিস্থানের সঙ্গেও ইংরেজদের যুদ্ধ বাধে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাদের কিছু না কিছু লাভ হয়। ইংরেজরা যখন সারা ভারতে তাদের রাজত্ব বেশ কায়েম করে আনছিল সে সময় ঘটল সিপাই বিদ্রোহ। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্রোহ সুরু হয়। ব্রিটিশ-অত্যাচারে ভারতীয় সৈন্যেরা মনে মনে খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিল। এই অসন্তোষে ইন্ধন যোগাল নানা রকমের গুজব। ভারতীয় সৈন্যেরা বন্দুকে যে টোটা ব্যবহার করত তার মধ্যে গরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত ছিল

এই রকম একটা কথা একবার খুব রটে যাওয়ায় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব দেখা দিল। ভারতের প্রধান প্রধান সৈন্যাবাসগুলিতে সৈন্যদের মধ্যে গোপনে ঠিক হয় যে তারা একই সময় প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করবে। অনেক দেশীয় রাজাও গোপনে সৈন্যদের সাহায্য করতে রাজী হলেন। মিরাটের সৈন্যেরা এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে তারা আগেই বিদ্রোহ করে বসল। ধীরে ধীরে এই বিদ্রোহ লক্ষ্ণৌ, কানপুর, দিল্লী প্রভৃতিতে ছড়িয়ে পড়ল। ভারতীয় জনসাধারণের অনেকেই সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিল। কয়েকস্থানে অসহায় ইংরেজ নরনারীদের উপরেও অত্যাচার করা হল। এই বিদ্রোহের প্রধান নেতা হয়ে দাঁড়ালেন একজন মারাঠী ; তাঁর নাম নানা সাহেব। বিদ্রোহীদের মধ্যে একতার যথেষ্ট অভাব ছিল। তাছাড়া তাদের মধ্যে চতুর ও দক্ষ দলপতি একজনও ছিল না। এদিকে ভারতের অনেক রাজাও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য আরম্ভ করলেন। শিখ এবং গুর্খারা ছিল বরাবরই ইংরেজদের পক্ষে। হায়দারাবাদের নিজাম, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া এবং আরও অনেক রাজা ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করলেন। সংখ্যায় অল্প হলেও ইংরেজদের মধ্যে শৃঙ্খলা ছিল খুব বেশী। তাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র এবং যুদ্ধ করবার কৌশল ছিল ভারতীয় সৈন্যদের চেয়ে ঢের ভাল। তাদের মধ্যে অনেকেই যে এ বিদ্রোহের সময় অত্যন্ত সাহস এবং ধৈর্য দেখিয়েছিলেন একথাও মেনে নিতে হবে বৈ কি।

কিন্তু বিদ্রোহীরা হেরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজরা ভারতের অনেক নিরীহ লোকের উপর অযথা এবং অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করল। নানা সাহেব এবং তাঁর কয়েকজন অনুচর কয়েকটি খুব খারাপ কার্য করেছিলেন সন্দেহ নেই ; কিন্তু নিষ্ঠুরতায় ইংরেজ সেনাপতিরা ভারতীয় সৈন্যদের হার মানালেন। বিদ্রোহ দমন করে ইংরেজ সেনাপতি নিল যখন এলাহাবাদ থেকে কানপুরে ফিরছিলেন তখন তিনি রাস্তায় যত লোক দেখেছিলেন তাদের প্রত্যেককেই নাকি ফাঁসী দিয়েছিলেন। বিদ্রোহীদের মধ্যেও অপূর্ব বীরত্বের নিদর্শন মেলে। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ পুরুষের সাজে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেন। ইংরেজদের বশ্যতা এই তেজস্বিনী যুবতী কিছুতেই স্বীকার করলেন না।

সিপাই বিদ্রোহ সাধারণ বিদ্রোহ নয়। পরাধীনতার গ্লানি মুছে ফেলবার জন্য ভারতবাসীদের এ ছিল প্রথম প্রয়াস। দুঃখের বিষয় একতা ও শৃঙ্খলার অভাবে এ যুদ্ধে ভারতের হার হল। ভারতে আসবার পর থেকে ইংরেজদের চেষ্টা ছিল কি করে ভারতবাসীদের মধ্যে বিভেদ আনা যায়। এ চেষ্টায় তারা খুবই সফল হয়েছিল। তার ফলে আমরা দেখলুম বিদ্রোহের সময় সব রাজারা এক সঙ্গে দাঁড়াতে পারলেন না। বিদ্রোহের পরও দেশীয় রাজাদের সহায়তায় ইংরেজরা ভারতে নানা অত্যাচার করে এসেছেন। শেষ পর্যন্ত এই বিভেদ নীতির ফল দাঁড়াল আরও ভয়ানক। হিন্দু আর মুসলমানের

মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলেছে তার পেছনে ইংরেজদের বহুদিনের প্রয়াস ছিল একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

বিদ্রোহ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দেখলেন যে ভারতের মত বিরাট রাজ্যকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনে রাখা আর ঠিক নয়। ফলে ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের সাম্রাজ্ঞী বলে ঘোষিত হলেন এবং ভারতবর্ষ সরাসরি এল ব্রিটিশ শাসনের অধীনে।

সমাজ এবং অর্থনীতির দিক থেকে ব্রিটিশ শাসন গোড়াতে ভারতে প্রচলিত সব ব্যবস্থা একেবারে উল্টে দেবার চেষ্টা করল। ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়দের সমাজ ব্যবস্থার অনেকখানি তফাৎ; সুতরাং নতুন আবেষ্টনীর মধ্যে এসে পড়ে ভারতবাসীরা খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। এ ব্যাপার বুঝতে পেরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পরে যথেষ্ট কৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন। ভারতবাসীর উপর হঠাৎ জোর করে কিছু চাপান হয় নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ভারতে কিন্তু তখনও চলছিল মধ্যযুগের অর্থনীতি। ফলে ব্যবসার প্রতিযোগিতায় ভারত অনবরতই হেরে যেতে লাগল এবং একে একে তার সবকটি ব্যবসা গেল নষ্ট হয়ে। ইংরেজ সওদাগর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য নিয়ে অনেক স্থানেই জোর করে ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পগুলি নষ্ট করে দিল।

মোগল আমলের শেষ, ব্রিটিশ আমলের সুরু। নিরক্ষর

দরিদ্র প্রজা প্রথমে বুঝতেই পারেনি তার দেশে কার রাজত্ব চলছে। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে দু-পক্ষের কুক্রিয়াসক্ত কর্মচারীরা জনসাধারণের উপর অন্যায় অত্যাচার আরম্ভ করল।

চারিদিকের এ অন্ধকার ভারতবাসীর জীবনে চলল আরও কিছুদিন। কিন্তু ভারতবর্ষ আবার জাগতে আরম্ভ করল। অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যিনি প্রথম মাথা তুলে দাঁড়ালেন তাঁর নাম রাজা রামমোহন রায়। রামমোহন বুঝতে পেরেছিলেন দেশের কুসংস্কারগুলি নিবারণ করতে না পারলে ভারতের লোক কোন দিনই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তাই তিনি প্রথমে আরম্ভ করলেন সমাজসংস্কার। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়ে যে কায আরম্ভ হয়েছিল তা আজও চলছে। রামমোহন ইংরেজদের ভাল গুণগুলি এবং ইংরিজি শিক্ষা গ্রহণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্যের দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ। রামমোহন রায়ই নব্যভারতের জন্মদাতা। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে আরও অনেক লোক ছিলেন যাঁরা একদিকে ধর্মসংস্কার এবং অন্য দিকে সমাজসংস্কারের ব্রত গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মসমাজের বাইরে সংস্কার কার্য বিশেষ ভাবে চালিয়েছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ধর্ম ও সমাজের সেবা ক্রমে আরও দুজনের হাতে এসে পড়ল।

রামমোহন রায়

ভারতের ইতিহাসে তাঁরাও চিরস্মরণীয়। তাঁদের একজন পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ, অন্যজন তাঁরই শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ; রামকৃষ্ণ অশিক্ষিত হলেও সে যুগের বাংলাদেশের কয়েকজন যুবকের মধ্যে ধর্মের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে যান। এই অগ্নিশিখার বিকাশ হতে থাকে তাঁর শিষ্যবৃন্দ—বিশেষ করে বিবেকানন্দের মধ্য দিয়ে। জ্ঞান ও কর্মের এমন অপূর্ব সমাবেশ আমরা ভারতে আর দেখি নি। বিবেকানন্দ ভারতের প্রতিদিকে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করে

শ্রীরামকৃষ্ণ

এক সঙ্গে জ্ঞান ও কর্মের যে প্রদীপ জ্বালাতে চেষ্টা করেছিলেন তা আজও জ্বলছে। রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ ভারতে এক নতুন যুগেরই প্রবর্তক। বাংলাদেশের বাইরে—বিশেষ করে পাঞ্জাবে স্বামী দয়ানন্দ প্রবর্তিত আর্য মিশনও এই সংস্কারের কায যথেষ্ট করেছে।

বিবেকানন্দ

ব্রাহ্ম সমাজের আবেদন ছিল শিক্ষিতের কাছে; আর্য-সমাজ

মধ্যবিত্ত সাধারণের মধ্যে নতুন প্রেরণা নিয়ে এসে শিক্ষা ও ভাবধারার সংস্কৃতি সাধন করেছে।

ইংরিজি শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে ভারতবাসী নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। পরাধীনতার অভিশাপ সে মর্মে মর্মে অনুভব করতে লাগল। বাংলাদেশে বিদেশী নীলকরদের অত্যাচারে জনসাধারণ হয়ে উঠছিল জর্জরিত। দীনবন্ধু মিত্র নীলদর্পণ লিখে তাদের আরও সচেতন করে তুললেন। বাংলার প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চটোপাধ্যায় বন্দে মাতরম সঙ্গীত রচনা করে জনগণের মনে নবীন উদ্দীপনা আনলেন। ভারতবাসী রাজনীতিক্ষেত্রে তাদের দাবী জানাতে আরম্ভ করল। এই দাবী নিয়ে কার্যে অগ্রসর হল ভারতীয় জাতীয় মহাসভা বা কংগ্রেস।

কংগ্রেস প্রথমে ভারতীয় চাকুরীগুলিতে ভারতীয়দের দাবী জানাল। কংগ্রেসের পেছনে শুধু ভারতবাসী নয়, কয়েকজন ভারতপ্রেমিক ইংরেজের সহানুভূতি এবং উৎসাহ ছিল। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইএ কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। প্রথম সভাপতি ছিলেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সে যুগের কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে ফিরোজ শা মেটা, বদরুদ্দিন তায়েবজী এবং বিশেষ করে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দাদাভাই নৌরজীর নাম করা যেতে পারে।

জাপানের কাছে রুশিয়ার পরাজয় এবং ১৯০৫ সালে বাংলাদেশ ভাগ করার চেষ্টা—এ দুটি জিনিষ কংগ্রেসের মধ্যে

নতুন প্রাণের সঞ্চার করল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কংগ্রেস এবার যুদ্ধে নাবল। ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগ রদ করবার জন্য বাঙালীদের অদম্য চেষ্টা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এ সময় ভারতের একদল শিক্ষিত তরুণ অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে ইংরেজ-শাসনকে অচল করতে চাইলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ এবং আরও অনেকে। বোমা ফেলে ইংরেজ কর্মচারীদের হত্যা করার চেষ্টা অনেক স্থানেই আরম্ভ হল। ইতিমধ্যে আর একজন নেতা ভারতের জনসাধারণকে কংগ্রেসের আরও অনেক কাছে টেনে নিলেন। ইনি বালগঙ্গাধর তিলক। তিলক এবং বাংলার কয়েকজন নেতা কংগ্রেসের প্রচলিত নীতিকে সরিয়ে দিয়ে উগ্রতর নীতির অনুসরণ জানিয়ে এক প্রস্তাব আনলেন। ফলে মধ্যপন্থী এবং চরমপন্থী এই দুই দলে কংগ্রেস ভাগ হয়ে গেল। প্রথম দলের একজন শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেন গোপাল কৃষ্ণ গোখলে।

১৯০৫ সাল থেকে কংগ্রেস ও ভারত গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সামনাসামনি যে বিরোধ আরম্ভ হল, তা ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌তে লাগল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পুলিশের সাহায্যে ভারতে উগ্র দমন নীতির আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এ রকম অবস্থার মধ্যে ১৯১৪ সালের মহাসমর আরম্ভ হল।

যুদ্ধ আরম্ভ হতে না হতে নানা আইনের সাহায্য নিয়ে গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের মুখ বন্ধ করে দিলেন। এ যুদ্ধে

ভারতবাসীদের সহানুভূতি ইংরেজদের পক্ষে থাকবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু যেহেতু ভারত পরাধীন সেজন্য তাদের মতামত না নিয়েই এ যুদ্ধ ভারতের যুদ্ধ বলে প্রচারিত করা হল। কংগ্রেসের মধ্যপন্থীদলের কেউ কেউ ব্রিটিশের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হলেন। অন্যদিকে জার্মানীর কাছ থেকে গোপনে অস্ত্র নিয়ে এসে তাই দিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য ভারতে একটি বিপ্লবী দলও গড়ে উঠল। নানাভাবে টাকাকড়ি তুলে গবর্ণমেন্ট বলতে লাগলেন ভারত স্বেচ্ছায় যুদ্ধে অর্থ সাহায্য করছে।

যুদ্ধের সময় বাইরে থেকে আমদানী বন্ধ হয়ে যাওয়াতে ভারতে কয়েকটি শিল্প গড়ে উঠল। জামসেদজী টাটা বিহারে যে লোহা ও ইস্পাতের কারখানা আরম্ভ করেছিলেন যুদ্ধের সময় তা এক বিরাট শিল্পে পরিণত হল। বোম্বাই এবং বাংলাদেশে কাপড়ের কল ও কেমিকেলের কারখানা গড়ে উঠতে লাগল। একদিক থেকে যুদ্ধ ভারতীয় শিল্পের খানিকটা উন্নতি সাধন করেছিল বললে ভুল হবে না।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালিয়েছিলেন তার ফলে তিনি ভারতের রাজনৈতিক জীবনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করলেন। যুদ্ধের সময় থেকে গান্ধীকেই শ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে জনসাধারণ মেনে নিতে আরম্ভ করেছিল। অহিংসা, আত্মশুদ্ধি এবং বলপ্রকাশ না করে অন্যায়ের প্রতিরোধ ভারতের কেন—জগতের রাজ-

নীতিতে গান্ধীর শ্রেষ্ঠ দান। রাজনীতির ক্ষেত্রে এ গুলির প্রয়োগ তাঁর আগে অন্য কেউ করেন নি।

যুদ্ধের সময় ভারতবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ থামিয়ে রাখবার জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পাকে প্রকারে জানিয়েছিলেন যে যুদ্ধ থেমে গেলে ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে। যুদ্ধ থেমে গেলে ভারতবাসী যা পেল তা কিছু নয় বললেই চলে। অসন্তোষ ক্রমেই বাড়তে লাগল; ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে অমৃতসর হত্যাকাণ্ডের পর ভারতের ধৈর্য শেষ সীমায় পৌঁছাল। ১৯২১, ১৯২৪ এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের সঙ্গে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কঠিন সংঘর্ষ বাধল। ভারতের মত এত বড় এবং এত শক্তিশালী একটি দেশকে দাবিয়ে রাখা যায় না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তা পারেনও নি। ভারতের সমস্যা যখন ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠছে এমন সময় ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভ হল।

মোহনদাস গান্ধী

জাপান যুদ্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে নেওয়া হল। পূর্ব সমর প্রাঙ্গনে সম্মিলিত শক্তিরা জাপানের সঙ্গে যে যুদ্ধ করছিলেন ভারতই ছিল তার কেন্দ্রস্থল। নানারকম মালমসলা, রসদ, সৈন্য

প্রভৃতি দিয়েও ভারতবর্ষ নেহাৎ কম সাহায্য করে নি। জার্মানী যখন মধ্যপ্রাচ্যে এগিয়ে আসছিল তখন ভারতের জোরেই তাকে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল। ব্রিটিশ শক্তি যুদ্ধ জয়ের জন্য ভারতকে অনবরত শোষণ করে যাচ্ছিলেন। ফলে ভারতে অত্যন্ত অসন্তোষ দেখা দিল। কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি জানিয়ে দিল যে ভারতবাসীর মতামত নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হয় নি সুতরাং এ যুদ্ধের পেছনে ভারতের সত্যিকারের সমর্থন নেই। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের নেতৃত্বে বৃটিশ শক্তির সঙ্গে ভারতের সংঘর্ষ বাধে। ইতিহাসে এরই নাম হয়েছে আগষ্ট বিপ্লব। ১৯৪২ সালের শেষের দিকে বাংলা দেশ এবং দক্ষিণ ভারতে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। লক্ষ লক্ষ লোক এ দুর্ভিক্ষে মারা পড়ে।

সুভাষচন্দ্র বসু

চারিদিকের অসন্তোষ শতগুণ বেড়ে গেল। যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রসিদ্ধ জননেতা সুভাষচন্দ্র বসু ভারত থেকে পালিয়ে গিয়ে প্রথমে জার্মানীর এবং পরে জাপানের সাহায্য নিয়ে ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যে এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। এর নাম হয় আজাদ হিন্দ সৈন্যবাহিনী। এই সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নিয়ে অপূর্ব সাহস এবং কৌশলের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র ভারতের পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত চলে আসেন। কিন্তু সামরিক সাজসরঞ্জামের অভাবে

এবং জাপানের দুর্বলতার দরুণ তিনি ভারতে ঢুকতে পারেন নি।

সম্মিলিত শক্তি এ যুদ্ধে জয়ী হলেন বটে কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দেখলেন যে রিক্ত, অসন্তুষ্ট, অনশনক্লিষ্ট ভারতকে অধীনে রাখার অনেক বিপদ রয়েছে। ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্ট শ্রমিকদের হাতে চলে যাওয়ায় শাসন-নীতির পরিবর্তন ঘটল। অনেক চেষ্টার পর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত পেল পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত পূর্ণক্ষমতা-প্রাপ্ত ডমিনিয়ন হিসেবে তার মর্যাদা স্বীকার করে নেওয়া হল এবং স্বেচ্ছায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাম্রাজ্যের বাইরে চলে যাওয়ার ক্ষমতাও তাকে দিয়ে দেওয়া হল; কিন্তু দ্বিধাবিভক্ত না হওয়া পর্যন্ত ভারতের পক্ষে এ অধিকার লাভ সম্ভব হয়ে ওঠে নি। অনাদিকাল থেকে

যে ভারতবর্ষ এক তাকে ভেঙে পাকীস্তান ও ভারত এই দুটি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। এর পেছনে ভারতবাসীর যে সম্মতি রয়েছে তাও স্বীকার করে নিতে হবে। তবে বিভক্ত হবার ফলে দুই রাজ্যই যে দুর্বল হয়ে পড়ল তাও মেনে নিতে হবে। ভারতের বর্তমান অবস্থা হচ্ছে এই। ভবিষ্যতে দুটি রাজ্য কোন পথ ধরবে তা বলা কঠিন। ইতিহাসে ভবিষ্যদ্বাণী করা শুধু অসম্ভব নয়, বিপজ্জনকও বটে।

ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষের অনেক দুর্গতি ঘটেছে তা আমরা জানি। কিন্তু ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষ জগৎকে যা দিয়েছে তা ভুলে গেলেও চলবে না। তাছাড়া ইংরেজদের মত এমন একটি জাতের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে না এলে ঘুমিয়ে পড়া ভারতের জাগতে বোধ হয় বেশ খানিকটা দেরী হত। ইংরেজ শাসনের অবসানে আজ ভারতবর্ষের দিকে দিকে আমরা দেখেছি নবীন জাগরণ, নবীন উদ্যম, নব নব সম্ভাবনা।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইংরেজ আমলেই আমরা ভারতে জগতের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর সাক্ষাৎ পেলুম। তাঁদের মধ্যে রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ এবং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নাম উল্লেখ না করলে এ কাহিনী অসমাপ্ত থেকে যাবে।

নব্য জাপান

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইওরোপের মহাশক্তি-গুলির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে নতুন এক ক্ষমতা এসিয়া থেকে দেখা দিল; এ নব ক্ষমতা প্রাচ্যের উদীয়মান সূর্য জাপানের। এতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে জাপানের দান ছিল সামান্যই। জাপানীরা মোঙ্গল-রক্ত-সম্ভূত। নিজেদের সভ্যতা, বর্ণমালা, সাহিত্য ও শিল্প পদ্ধতি তারা পেয়েছিল চীনের কাছ থেকে। এ জাতির ইতিহাস সত্যিই বিস্ময়কর। প্রাচীন যুগে এখানকার শাসন ছিল সামন্ত-তন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। খৃষ্টের জন্মের কিছু পরে তাদের দেশে বীরত্বের যুগ আরম্ভ হয়। যাঁরা বীর তাঁরাই পেতেন দেশের ও দশের কাছ থেকে অজস্র সম্মান। চীনে এবং কোরিয়াতে জাপান যে যুদ্ধগুলি করেছিল সেগুলি অনেকটা ফরাসীদেশে ইংরেজযুদ্ধের মত। ষোড়শ শতাব্দীতে ইওরোপের সঙ্গে জাপানের সর্বপ্রথম পরিচয় ঘটে। ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে একটি চীনে নৌকো করে কয়েকজন পর্তুগীজ জাপানের সমুদ্রতীরে নামেন; ১৫৪৯ সালে ফ্রানসিস্ জেভিয়ার নামক বিখ্যাত যেসুট ধর্মপ্রচারক সে দেশে খৃষ্টান ধর্মপ্রচার করতে আরম্ভ করেন। প্রথম প্রথম জাপানীরা ইওরোপবাসীদের বেশ পছন্দ করত। ফলে

ইওরোপীয় ধর্মপ্রচারকেরা জাপানীদের মধ্যে অনেককেই খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করেন।

শেষ পর্যন্ত জাপানীদের ধারনা হল যে ইওরোপের লোকেরা উপদ্রব বিশেষ। এই ধারণা নিয়ে তারা খৃষ্টানদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে দুশ বছর ইওরোপবাসীদের জাপানে আগমন নিষিদ্ধ ছিল। এই দুশ বছর বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। তারা ছিল যেন অন্য কোন গ্রহের অধিবাসী। এ সময় সমুদ্রোপযোগী কোন জাহাজ জাপানে নির্মিত হতে দেওয়া হত না। জাপানবাসীরা দেশ ছেড়ে বাইরে যেতে পারত না।

দুশ বছর ধরে জাপানীরা এই অচলায়তনের মধ্যে বাস করে। সেই সামন্ততন্ত্রের যুগে অতি অল্পসংখ্যক যোদ্ধা বা অভিজাত ব্যক্তি জাপানে যথেচ্ছাচারী হয়ে তাঁদের ইচ্ছেমত শাসন কার্য চালাতেন। জাপানের এই যোদ্ধাদের বলা হত সামুরাই।

জাপানে যখন এই প্রকার কূপমণ্ডুকতা চলছিল সেই সময় বাইরের মুক্ত জগতে কিন্তু নতুন নতুন চিন্তাধারা এবং নব নব শক্তির উদ্ভব ঘটছিল। জাপান-সীমান্তে রহস্যময় বিদেশীদের জাহাজ প্রায়ই লাগতে আরম্ভ করেছিল। এই ব্যাপার নিয়ে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের পর বেশ কয়েকবার আমেরিকান, রুশ, ইংরেজ ও ডাচদের সঙ্গে জাপানীদের সংঘর্ষ

বাধে এবং প্রায় প্রত্যেক বারই তাদের নানা অপমান সহ্য করতে হয়। ক্রমে জাপানীদের জ্ঞানোদয় হল। তারা বুঝল পৃথিবীতে বড় হতে হলে এভাবে একলা থাকা চলে না। আশ্চর্য উদ্যম, অধ্যবসায় এবং বুদ্ধির সঙ্গে তারা শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য জাতিগুলির সভ্যতার কোঠায় পৌঁছাতে চাইল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশী উন্নতি জাপানীরা ছাড়া আর কোন জাতি করতে পারে নি। ১৮৬৬ সালে জাপানীরা ছিল অদ্ভুত সামন্ততন্ত্রের অধীন এক অতি অনুন্নত জাতি। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তারা হয়ে উঠল সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন। শ্রেষ্ঠ ইওরোপীয় জাতিগুলির সঙ্গে কোনও দিক দিয়ে তাদের প্রভেদ রইল না। এশিয়া যে চিরকালই ইওরোপের পশ্চাতে পড়ে থাকবে এ মিথ্যা ধারণা জাপানই প্রথম ভেঙ্গে দিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাপানের সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধিতে মানুষের চোখ এত ধাঁধিয়ে উঠেছিল যে পাশাপাশি ইওরোপীয় উন্নতি এবং সমৃদ্ধিকে লাগছিল নিষ্প্রভ ও ম্লান।

১৮৯৪ সাল থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত জাপান চীনের সঙ্গে যে যুদ্ধ করেছিল তার বিশদ বিবরণ আমরা এখানে দেব না। কিন্তু এই যুদ্ধের দশ বছর পরই জাপান রুশিয়ার বিরুদ্ধে আবার এক যুদ্ধে নামে। এই যুদ্ধ এসিয়ার দিক থেকে অতি গুরুত্ব-পূর্ণ। কারণ, এসিয়ার কাছে ইওরোপের পরাজয় হয় এ যুদ্ধেই প্রথম। ভাল সেনাপতি এবং যুদ্ধোপকরণের অভাবে রুশরা জলে এবং স্থলে উভয় স্থানেই জাপানীদের কাছে হেরে গেল।

প্রথম মহাসমর

১৮৭৮ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত—৩৬ বৎসর তথাকথিত শান্তি চলবার পর ইউরোপে আবার মহাসঙ্কট উপস্থিত হল। সার্লেমেনের যুগ থেকে ইউরোপে জার্মান আধিপত্যের প্রবলতম বিরোধী ছিল ফ্রান্স। এখন জার্মান সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধিতে ভয় পেয়ে ফরাসী দেশ রুশিয়ার সঙ্গে মিলে শক্ত হয়ে দাঁড়াল। জার্মানী,—অষ্ট্রিয়া ও ইটালীর সঙ্গে মিতালি করে ফ্রান্সের নবশক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে ত্রুটি করল না। প্রথম দিকে ইউরোপের ব্যাপারে ইংলণ্ড ততটা মন দেয় নি। কিন্তু জার্মান নৌশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজরাও ফরাসী এবং রুশের দলে যোগ দিতে বাধ্য হল। জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ামের সমুদ্রপারে সাম্রাজ্য-চেষ্টার ফলে ক্রমে জাপান এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যও দাঁড়াল জার্মানীর বিপক্ষে।

ইউরোপের পরিস্থিতি যখন এইরকম তখন প্রত্যেক দেশই ক্রমাগত অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করে নিজেকে সুরক্ষিত করতে চেষ্টা করছিল। বছরের পর বছর রণতরী, কামান এবং যুদ্ধোপকরণের সংখ্যা বেড়ে চলেছিল। অবস্থার দ্রুত অবনতি দেখে মনে হচ্ছিল যুদ্ধ বুঝি ঠেকান গেল না। কিন্তু তবু ইউরোপের সহস্র সহস্র নিরীহ নরনারী একথা ভাবতে পারে

নি যে এক মহাসমর ডেকে এনে মানুষ শেষ পর্যন্ত নিজেরই সর্বনাশ করবে।

১৯১৪ সালের জুলাই মাসে যুদ্ধ কিন্তু সত্যিই এল। অষ্ট্রিয়ার আর্চডিউক ফ্রান্সিস্ ফার্ডিনেণ্ডের হত্যাব্যাপার নিয়ে অষ্ট্রিয়া এবং সার্বিয়ার মধ্যে প্রথম গোলযোগের সূত্রপাত হয়। জার্মানী অষ্টিয়ার পক্ষে যোগ দেয়, রুশিয়া ও ফ্রান্স সার্বিয়ার পক্ষ সমর্থন করে। জার্মান সেনাপতিদের মতলব ছিল হঠাৎ ঘা দিয়ে ফ্রান্সকে অবশ করে দেওয়া। কিন্তু ফ্রান্সকে আক্রমণ করতে হলে বেলজিয়াম পার হতে হয়; আর বেলজিয়াম পার হতে গেলে সন্ধিভঙ্গের অপরাধ করতে হয়; কারণ পূর্বসন্ধি অনুসারে জার্মানী বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা মেনে চলবে এই ছিল ব্যবস্থা। জার্মানী সন্ধিভঙ্গ করে বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে সৈন্য পাঠাতে আরম্ভ করল। জার্মান সৈন্য বেলজিয়াম সীমান্ত অতিক্রম করবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংলণ্ড বেলজিয়ামের পক্ষে যোগ দিয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। জাপান ইংলণ্ডের কার্য সমর্থন করল আর তুর্কী যোগ দিল জার্মানীর পক্ষে। ১৯১৫ সালে ইটালী অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল এবং সে বছর অক্টোবর মাসে বুলগেরিয়া জার্মান শক্তির সঙ্গে যোগ দিল। ১৯১৬ সালে রুমানিয়া এবং ১৯১৭ সালে যুক্তরাজ্য ও চীন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

যুদ্ধের অনুচর মহামারী ১৯১৮ সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে

দেখা দেয় নি। মহাসমরের চার বৎসর চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাধির আক্রমণ রোধ করবার প্রাণপণ চেষ্টা হচ্ছিল। কিন্তু তারপর যুদ্ধ শেষের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবী জুড়ে দেখা দিল মৃত্যু মত ভীষণ ইনফ্লুয়েনজা। সহস্র সহস্র লোক এই ঘৃণিত ব্যাধির কবলে প্রাণত্যাগ করল। ১৯১৮ সাল থেকে ইউরোপে বিশেষ করে পরাজিত দেশগুলির উপর নেমে এল দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। যুদ্ধের সময় অধিকাংশ চাষী সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল। অতএব সারা পৃথিবীতেই খাদ্য শস্যের পরিমাণ আসছিল কমে। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল যে পরিমাণ গম ও চাল পৃথিবীতে দরকার তা উৎপন্ন হচ্ছে না। যুদ্ধের সময় বহুস্থানে রেল লাইন নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল, সাবমেরিণের উৎপাতে অনেক জাহাজ ডুবে গিয়েছিল; সুতরাং যুদ্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যশস্যের যথাযথ বিতরণ সম্ভব হয়ে ওঠে নি। মহাসমরের চতুর্থ বৎসরে ঘরবাড়ি, কাপড় চোপড় এবং সভ্য জীবনযাত্রার অনেক কিছু উপকরণেরই অভাব হয়েছিল। ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে যুদ্ধ থামল। ঐ বৎসরের গোড়ার দিকে জার্মানরা তাদের সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রায় প্যারিস পর্যন্ত চলে এসেছিল। কিন্তু তারপর কিছু করবার মত শক্তি ও সামর্থ্য তাদের আর ছিল না। ক্রমাগত যুদ্ধ করে করে তাদের অর্থ ও ক্ষমতা দুটিই ফুরিয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে যুক্তরাজ্যের যুদ্ধে অবতরণ তাদের একেবারে কাবু করে ফেলল।

যুদ্ধে জার্মাণীর হার হল। কিন্তু এই কয়েক বৎসরের যুদ্ধ সমস্ত পৃথিবীতে ওলট পালটের সৃষ্টি করল। এত দিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলত প্রধানতঃ দুপক্ষের সৈন্যদের মধ্যে। কিন্তু এই যুদ্ধে বিমান ও গ্যাসের ব্যবহারে দুপক্ষের অসামরিক নির্দোষী জনসাধারণও যথেষ্ট বিপদ ও লাঞ্ছনা ভোগ করল। তাছাড়া ট্যাঙ্ক, মাইন, সাবমেরিন এবং অতি শক্তিশালী কামানের ব্যবহারের ফলে প্রাণহানি হল অত্যন্ত বেশী। বুঝতে পারা গেল এর পর থেকে যুদ্ধ আরম্ভ হলেই তার ফল হবে অতি ব্যাপক। এ যুদ্ধের ফলে এক কোটি সৈন্য মৃত্যু মুখে পতিত হয়; তাছাড়া বহু সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তি হতাহত হয়। যুদ্ধের ফলে কত নারী ও বালক বালিকা সহায়হীন হল তা ধারণা করাও কঠিন। যুদ্ধের জন্য কত লোকের ধনসম্পত্তি নষ্ট হল এবং যুদ্ধ চালাবার জন্য কত টাকা খরচ হল তার হিসেব কে দেবে?

যাঁরা এই যুদ্ধের সমর্থক ছিলেন তাঁরা বললেন যে পৃথিবীতে যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্যই এই মহাসমর এসেছে এবং এই যুদ্ধই নাকি পৃথিবীকে গণতন্ত্রের উপযোগী করে তুলবে। পরের কয়েক বৎসরের ইতিহাস চোখে আঙ্গুল দিয়ে তাঁদের দেখিয়ে দিল যে তাঁরা যা ভাবছিলেন তা সম্পূর্ণ ভুল।

যুদ্ধ বিরতির পর যুক্তরাজ্যের সভাপতি উইলসন আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র-সঙ্ঘ স্থাপন করবার এক পরিকল্পনা

নিয়ে ইওরোপে এলেন। সঙ্ঘবদ্ধভাবে সমস্ত পৃথিবীতে শান্তির প্রচেষ্টা মানুষ করল এই প্রথম। ইওরোপের রণক্লিষ্ট নরনারী অন্তরের সঙ্গে এই রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা অনুমোদন করল। ফলে জেনেভা সহরে এই সঙ্ঘ স্থাপিত হল।

যুদ্ধোত্তর ইওরোপ (১৯১৮—১৯৩৮)

যুদ্ধ থেমে গেল। তারপর জগতে যে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ এল তার কথা আগে বলা হয়েছে। ইওরোপের মানচিত্রকে এ যুদ্ধ অনেকটা বদলে দিয়ে যায়। জার্মান ও তুর্কী সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গিয়ে ইওরোপে কয়েকটি ছোট ছোট স্বাধীন দেশের সৃষ্টি হল। লিথুয়ানিয়া, ফিনল্যাণ্ড এবং পোল্যাণ্ড আর আগেকার মত রইল না। তাছাড়া ইওরোপের কয়েকটি দেশের রাষ্ট্র ও সমাজের কাঠামোই গেল বদলে।

১৯২০ সালে প্যারিসের সন্ধি স্থাপিত হবার পর দেখা গেল যে প্রায় সমগ্র পৃথিবী দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। যুদ্ধের ফলে যাদের লাভ হল তারা পড়ল একদলে; যাদের হল না তারা গেল অন্যদলে। যে সব দেশ সম্মিলিত জাতিদের পক্ষে যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে দু একটিও এই না পাওয়ার দলে পড়ে গেল।

রুশিয়া সম্মিলিত জাতিগুলির পক্ষ অবলম্বন করলেও যুদ্ধ শেষে দেখা গেল তার কিছুই লাভ হয় নি। ১৯১৮ সালের রুশিয়াতে আমরা দেখি বুভুক্ষু চাষীর দল, অসন্তুষ্ট সৈন্যবাহিনী আর জনসাধারণের দুঃখে সম্পূর্ণ উদাসীন জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে। জারদের চিরকালের আকাঙ্ক্ষা ছিল যুদ্ধ আর যুদ্ধজয়; তাঁরা রাজসভার জাকজমক নিয়েই ব্যস্ত

থাকতেন। দেশের জনসাধারণ যে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে উঠ্‌ছে এ যেন তাঁরা দেখেও দেখতেন না। যুদ্ধের সময় রুশিয়াতে যে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি ছিল তাদের মধ্যে বলসেভিকরা প্রথম থেকেই ছিল যুদ্ধের বিপক্ষে। ডুমা নামক একটি ব্যবস্থাপক সভা রুশিয়াতে ছিল বটে; কিন্তু আসল ক্ষমতা সবই ছিল জারের হাতে।

এই অবস্থায় ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে রুশিয়ায় এক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এর ফলে জারকে রাজ্য ছেড়ে দিতে হল। গণতন্ত্র স্থাপিত হবার পূর্বে সে দেশে এক মধ্যকালীন গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হল এবং তার নেতা হলেন লভভ্‌। তাঁর মতামতের সঙ্গে জনসাধারণের সহানুভূতি ছিল না। কাজেই ১৯১৭ সালের আগষ্ট মাসে লভভ্‌ ও কেরেন্‌স্কি সব ক্ষমতা দখল করে নিতে চাইলেন। কিন্তু তাঁদের এ চেষ্টা বিফল হল।

১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে আবার এক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ বিদ্রোহের ফলে বলসেভিকরা ক্ষমতা হাতে পেল। বলসেকভিদের দুজন নেতা লেনিন ও ট্রট্‌স্কি বললেন তাঁদের উদ্দেশ্য হবে,—জার্মানদের সঙ্গে সন্ধি করা, শাসনক্ষমতা শ্রমিকদের হাতে দিয়ে দেওয়া, সর্বাঙ্গীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন এবং রুশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করে অসন্তোষ নিবারণ।

বলসেভিকরা দলে খুব ভারী ছিল না বলে ক্ষমতা হাতে রাখবার জন্য দল থেকে একজন অধিনায়ক দাঁড় করান হল।

বলা হল ইনি শ্রমিকদের ইচ্ছেকে কাযে রূপ দেবেন মাত্র। প্রথম অধিনায়ক হলেন লেলিন। বলশেভিকরা ক্ষমতা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে আমূল পরিবর্তন আসতে লাগল। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে প্রভেদ তুলে দেওয়া হল; প্রত্যেক লোককে কায করতে বাধ্য করা হল। গবর্ণমেণ্ট সমস্ত জমি জমিদার ও গৃহস্থদের কাছে থেকে নিজে নিয়ে নিলেন। রেলপথ, খনি, বড় বড় ব্যবসা সবই হল রাজ্যের অর্থাৎ জন-সাধারণের সম্পত্তি। ব্যবসা বাণিজ্য থেকে আরম্ভ করে ব্যাঙ্ক পর্যন্ত সমস্তই এল রাষ্ট্রের হাতে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন করে নিলেন। চার্চকে সাহায্য দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। প্রচলিত অর্থে টাকাকড়ির ব্যবহার রুশিয়ায় আর রইল না। নবক্ষমতাপ্রাপ্ত বল্‌সেভিকরা নিজেদের কম্যুনিষ্ট বলে প্রচার করল। তারা দেশের জন্য লাল রংএর পতাকা নির্বাচন করল; দেশের সৈন্যবাহিনীর নাম হল লাল ফৌজ। রুশিয়ার নতুন নাম হল ইউনিয়ন অব্ সোশালিষ্ট সোভিয়েট রিপাবলিকস্।

১৯২৫ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর ষ্ট্যালিন তাঁর স্থান নিলেন। নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতির অনুসরণের ফলে আমরা ১৯৩৮ সালে রুশিয়াকে পেলুম এক অত্যন্ত উন্নত ও ক্ষমতাশালী দেশে হিসেবে। এদেশে অতি অল্পদিনের মধ্যে নানা রকম বড় বড় যন্ত্রশিল্প খুবই উন্নত হয়ে উঠল। ১৯১৮ সালে এখানে মধ্যযুগের কৃষি ব্যবস্থা চলছিল; তা

থেকে উন্নত হয়ে ১৯৩৮ সালে এদেশের কৃষিব্যবস্থা হল জগতের সব দেশের চেয়ে ভাল। শিক্ষা-ব্যবস্থারও অসাধারণ উন্নতি লক্ষ্য করা গেল। ইওরোপ ও আমেরিকার শক্তিশালী দেশগুলি গভীর সন্দেহ ও ভয়ের সঙ্গে রুশিয়ার বলসেভিকদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল। প্রথমে রুশিয়াতে বলসেভিক আধিপত্য তারা মানতেই চায় নি; পরে উপায়ান্তর না দেখে রুশিয়াকে বলসেভিক রুশিয়া বলে মেনে নিতে বাধ্য হল।

ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান তুলে দিয়ে শ্রমিকদের দ্বারা শাসন কাজ কী করে চালান যেতে পারে এই নতুন ব্যবস্থা তা পৃথিবীকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। এ চেষ্টা কতদূর ফলবতী হবে এখনও তা বলা কঠিন। তবে খানিকটা সুফল যে পাওয়া গিয়েছে তা না মানলে চলবে না। রুশিয়ার শ্রমিকদলের অধিনায়ককে অনেকে ডিক্টেটর বা সর্বাধিনায়ক আখ্যা দিয়ে থাকেন। তাঁরা বলেন বাস্তবিক পক্ষে এদেশে একজনের হাতেই অসীম ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলসেভিকদলের নায়ক কতটা তাঁর দলের মুখপাত্র এবং কতটা স্বেচ্ছাচারী তা বোঝবার সময় এখনও আসেনি। তবে একটা কথা অস্বীকার করা চলবে না। পৃথিবীর দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া এবং নিপীড়িত দেশগুলির অধিকাংশেরই সহানুভূতি রয়েছে বলসেভিক রুশিয়ার প্রতি; আর কার্ল মার্কস সমাজব্যবস্থার যে বিশ্লেষণ দেখিয়ে বলসেভিকদের

অনুপ্রাণিত করেছিলেন, সারা জগতের গরীবরা আজ সেই বিশ্লেষণে অনেক খানি আস্থাবান।

রুশিয়ার মত ইটালীও যুদ্ধে সম্মিলিত জাতিগুলির দলে ছিল। কিন্তু প্যারিসের সন্ধিতে যে ব্যবস্থা হল তা তাকেও নিরাশ করল। যুদ্ধের পরে ইটালীর স্থানে স্থানে চাষীদের বিদ্রোহ দেখা যেতে লাগল। দেশের অব্যবস্থার জন্য গভর্ণমেণ্টকে দায়ী করা হল।

এই সময় কামারের ছেলে বেনিটো মুসোলিনি ইটালীতে মাথা তুলে দাঁড়ালেন। ইনি প্রথম জীবনে ছিলেন একজন সমাজতান্ত্রিক ; পরে নানা কারণে সমাজতান্ত্রিকতার প্রতি তাঁর বিদ্বেষ জন্মে যায়। তিনি নিজেই একটি মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। এর নাম ফ্যাসিজম বা ফ্যাসিবাদ। মুসোলিনির মতে সমাজতন্ত্রের গুণগুলি এবং অন্যান্য নতুন অনেক কিছুর একত্র সমাবেশ তাঁর সৃষ্ট এই ফ্যাসিবাদের মধ্যে পাওয়া যাবে। ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে তিনি তাঁর দল নিয়ে রোমে চলে আসেন ও শাসনক্ষমতা অধিকার করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে কেউ বাধাই দিল না। মুসোলিনি নামে হলেন প্রধান মন্ত্রী ; কিন্তু কাজে তিনি হলেন ইটালীর সর্বাধিনায়ক। ইটালীর রাজাকে তিনি সাক্ষীগোপাল করে বসিয়ে রাখলেন মাত্র। ক্ষমতা হাতে পেয়ে মুসোলিনির প্রথম কাজ হল দেশে সব রকম বিরুদ্ধ মতবাদকে চেপে দেওয়া। এমন কি ফ্যাসিষ্টদের কার্যকলাপের কোনরকম বিরুদ্ধ

আলোচনাও যে তিনি সহ্য করবেন না তা তাঁর কার্যবিধি দেখে বোঝা গেল। মজুরদের অধিকার বাড়িয়ে দিতে তিনি রাজী হলেন; কিন্তু পুঁজিবাদীদের ধ্বংস করতে তিনি চাইলেন না। নানা ভাবে দেশের উৎপাদন শক্তি বাড়াবার চেষ্টা হতে লাগল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে ইটালীর অনেক উন্নতিও তিনি করলেন। তবে ফ্যাসিবাদের মূলকথা তিনি ইটালীর জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে কিছুমাত্র ত্রুটি করলেন না। দেশই সব; ইটালী প্রথম, তারপর সমস্ত জগৎ। ইটালীয়ানদের অতি যত্নের সঙ্গে এই শিক্ষা দেওয়া হল। তাদের আরও বলে দেওয়া হল যে তারাই হচ্ছে প্রাচীন রোমানদের বংশধর। সুতরাং রোমানরা যেমন শক্তিশালী ছিল, তারা যেমন পৃথিবী জুড়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল ইটালীয়ানদেরও তা করতে হবে। সাম্রাজ্য বিস্তার করতে হলেই যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধের গুণগান ফ্যাসিস্ট মতবাদের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। দেশ—অর্থাৎ মুসোলিনি যা বলবেন অন্তরের সঙ্গে তা সত্য বলে মেনে নেওয়া ও বিশ্বাস করা এবং আবশ্যক হলে তার জন্য প্রাণ দেওয়া ফ্যাসিষ্টদের আসল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল।

যুদ্ধের প্রতি মুসোলিনির এই আগ্রহ ১৯৩৫ সালে অত্যন্ত উগ্র হয়ে দেখা দিল। আফ্রিকায় ইথিওপিয়া বলে একটি ছোট অনুন্নত রাজ্য আছে। খনিজ সম্পদের দিক থেকে এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ ছিল খুবই উজ্জ্বল। মুসোলিনির চোখ

অনেক দিন থেকেই এই ছোট রাজ্যটির দিকে ছিল। ইটালীর সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম চেষ্টা হল এই রাজ্যটির উপর। অতি তুচ্ছ কারণে ইথিওপিয়ার সঙ্গে ইটালীর কলহ আরম্ভ হল। সঙ্গে সঙ্গে ইটালী যুদ্ধ ঘোষণা করল। মুসোলিনির এই অন্যায় ব্যবহার একমাত্র জার্মানী ছাড়া অন্য কোন শক্তিশালী জাতিই সমর্থন করল না। আন্ত-র্জাতিক রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভাতে অধিকাংশ জাতি ইটালীর এ ব্যবহারের নিন্দা করল এবং ঠিক হল কেউ ইটালীকে এ যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র বা টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্য করবে না। মুসোলিনি কিন্তু এ জন্য মোটেই চিন্তিত হন নি। তিনি ইটালীর উন্নত সমরোপকরণের সাহায্যে অনুন্নত আতঙ্কগ্রস্ত ইথিওপিয়ানদের হারিয়ে দিয়ে সহজেই ইথিওপিয়া অধিকার করে নিলেন। দুঃখের বিষয় মুখে ইটালীর নিন্দে করলেও ইংলণ্ড বা আমেরিকা কার্যতঃ ইটালীর এই হীন প্রচেষ্টায় বিশেষ বাধা দিলেন না।

যুদ্ধের পর পরাজয়ের গ্লানি মাথায় বহন করে জার্মানীর কয়েক বছর কাটল। প্যারিসের সন্ধি অনুসারে জার্মানীতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা হল। কিছুদিন এই সাধারণতন্ত্র চলেও ছিল। কিন্তু পরাজয়ের পর সম্মিলিত জাতিরা জার্মানীর প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিল জার্মানীর জনসাধারণ তা ভুলল না। যুদ্ধের পর সমাজতান্ত্রিক দল জার্মানীতে কিছুদিন আধিপত্য করে। কিন্তু তাদের

কাযে জনসাধারণের বিশেষ আস্থা ও আগ্রহ ছিল বলে মনে হয় না। জার্মান জনগণের চিন্তা কোন দিকে লুডেনড্রফ ও হিটলারের দল প্রথম তা বোঝেন। লুডেনড্রফের মৃত্যুর পর হিটলার নিজের দল ভারী করতে চেষ্টা করেন। প্রথমে বার কয়েক চেষ্টা করেও তিনি কৃতকার্য হন নি। ১৯৩৩ সালের নির্বাচনে তিনি অন্য দলগুলিকে হারিয়ে দিয়ে জয় লাভ করেন। তাঁর নতুন দলের নাম হল নাৎসী দল। এ বছর তিনি জার্মানীর চান্সেলার মনোনীত হলেন; হিণ্ডেনবুর্গ হলেন সভাপতি। ১৯৩৪ সালে হিণ্ডেনবুর্গ মারা যাবার পর জার্মানীতে হিটলারই সর্বেসর্বা হয়ে বসলেন। ইহুদীদের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে জার্মানদের একতাবদ্ধ করা, ইউরোপের যে দেশে যত জার্মান ছিল তাদের একদলে এনে নতুন করে এক জার্মান সাম্রাজ্যের সৃষ্টি এবং জার্মানীকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত করা ছিল হিটলারের স্বপ্ন। ক্ষমতা হাতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজ, রেডিও, সিনেমা বই ও বক্তৃতার মধ্য দিয়ে অতি সূক্ষ্ম প্রচার কার্য চালিয়ে হিটলার জার্মান জনসাধারণের মন হরণ করে নিলেন। নাৎসীদলের বিপক্ষে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন অতি কৌশলে তাদের পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। ইহুদীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করে তাদের জার্মানী থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল এবং তাদের অর্থ ও সম্পত্তি গভর্ণমেন্ট বাজেয়াপ্ত করে নিলেন। যুদ্ধের প্রতি জনসাধারণের উন্মাদনা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল,—

কেন না হিটলার তাদের মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন যে সকলেই জার্মানীর বিপক্ষে এবং জার্মানরা জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি বলে সব দেশেরই একমাত্র উদ্দেশ্য জার্মান শক্তিকে খর্ব করা। জার্মান সামরিক শক্তিকে যত উপায়ে উন্নত করতে পারা যায় হিটলার তা করতে ত্রুটি করলেন না।

ইটালী ও জার্মাণীর দেখাদেখি ইওরোপের কয়েকটি দেশে ডিক্টেটরশিপের হিড়িক দেখা দিল। স্পেনের গৃহযুদ্ধ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করল; ছোট্ট আয়ার্ল্যাণ্ড চাপ দিয়ে ইংলণ্ডের কাছ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা আদায় করে নিল। ইংলণ্ড এ সব দেখে মনে করল তার এত দিনের পার্লামেণ্টারী শাসনতন্ত্রেও বুঝি বা ভাঙ্গন ধরে। সুতরাং গোড়া থেকেই ইংলণ্ডের জনসাধারণ ইটালী ও জার্মাণীর এই সব নবীন উদ্যম প্রীতির চোখে দেখে নি।

যুদ্ধোত্তর এসিয়া (১৯১৮—১৯৩৮)

চীন যুদ্ধে সম্মিলিত জাতিগুলির পক্ষে যোগ দিয়েছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে। প্যারিসের শান্তির পর দেখা গেল তার কিছুই লাভ হয়নি। বরঞ্চ যুদ্ধের পর বিদেশী কয়েকটি শক্তি আরও শক্ত হয়ে তার উপর চেপে বসল। যুদ্ধোত্তর যুগ চীনে এক অরাজকাতার যুগ ছিল বললেই চলে। এখানে ওখানে লুটপাট লেগেই থাকত। তাছাড়া ১৮৩৯—৮৪২ সালের আফিং যুদ্ধের ফলে প্রায়ই চীন ঘরে বাইরে অপমানিত ও অপদস্থ হতে লাগল। লোভী ইওরোপীয় শক্তিগুলি আফিংএর ধোঁয়ায় চীনাদের মন আচ্ছন্ন করে রেখে নিজেদের স্বার্থ অন্বেষণ করতে লাগল; আর পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যদেশ চীন আফিংএর নেশায় ঝিমুতে লাগল।

প্রায় মৃত্যুর মতই গভীর এই মানসিক জড়তাকে চীন থেকে প্রথম তাড়াতে চেষ্টা করলেন ডাঃ স্থন ইয়াৎ সেন। এঁকে নব্য চীনের মাৎসিনি বললেই চলে। বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এবং আমেরিকার সংস্পর্শে এসে ইনি নিজের দেশের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করলেন। দৃঢ়সংকল্প হয়ে তিনি ঠিক করলেন দেশকে বাঁচাতেই হবে। তিনি যে দল গঠন করলেন তার কায হল—চীনকে বিদেশী আধিপত্য

থেকে মুক্ত করা, চীনে জাতীয়তাবাদী গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা এবং দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি।

১৯২১ সালে পিকিং গবর্ণমেণ্ট ও ক্যাণ্টন গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেকেই নিজেকে চীনের একমাত্র ন্যায্য গবর্ণমেণ্ট বলে দাবী করলেন। ক্যাণ্টন গবর্ণমেণ্টের কর্ণধার হলেন স্থন ইয়াৎ সেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে এঁকে চৈনিক সাধারণতন্ত্রের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৯২৫ সালে রুশিয়া থেকে সাহায্য পেয়ে স্থন ইয়াৎ সেনের দলে ভাঙ্গন ধরল। চীনের কম্যুনিষ্টদলের সেই থেকেই উৎপত্তি। যাই হোক, ১৯২৫ সালে তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর দল তাঁরই অনুচর চিয়াং কাই শেকের অধীনে অদম্য উৎসাহে কায চালাতে লাগল।

চীনের দিকে দিকে নব জাগরণ দেখা দিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, আধুনিক সাময়িক উদ্যম এসব দিকে চীন গবর্ণমেণ্টের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়ল।

কিন্তু চীনের অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াল জাপান। চীন ও জাপানের মধ্যে ১৯৩১ সাল থেকে বিরোধ বাধে। এ বিরোধ শুধু চীনের উন্নতিকেই আটকে রাখেনি, চীনের অস্তিত্ব পর্যন্ত মুছে ফেলতে চেয়েছিল।

চীন ও জাপানের বিরোধ কেন বাধল তা বুঝতে হলে গত যুদ্ধের পর থেকে জাপানের রাজনীতির মারপ্যাঁচ কিছুটা বোঝা দরকার। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর থেকে জাপান নানা দিকে উন্নতি করেই চলেছিল। তার ব্যবসা ও পণ্য এসিয়ার

প্রত্যেক দেশের পথে ঘাটে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ব্যবসা বাড়াতে হলে কাঁচা মালের প্রয়োজন। কিন্তু কাঁচামালের সংস্থান জাপানের বড় বেশী ছিল না। এদিকে সে দেশের জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে। বাড়তি জনসংখ্যার স্থান সঙ্কুলন ছোট কয়েকটি দ্বীপের সমষ্টিতে কিছুতেই হতে পারে না; সুতরাং জাপানের সাম্রাজ্য বাড়াবার প্রয়োজনও ছিল। তাছাড়া চীনে ইওরোপ ও আমেরিকার প্রতিপত্তি ক্রমেই বেড়ে উঠ্ছিল। ঘরের পাশে শক্তিশালী বিদেশী জাতিগুলির সমাবেশ জাপান ভাল চোখে দেখতে পারে নি। এই সব নানা কারণে সে চীনকে গ্রাস করতে উদ্যত হল। তার প্রথম শিকার হল চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ। এ প্রদেশ নানা খনিজ সম্পদের জন্য প্রসিদ্ধ। মাঞ্চুরিয়া জয় করে সেখানে মাঞ্চুকুও নামক এক তথাকথিত স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে জাপান সাম্রাজ্য বিস্তৃতির দিকে মন দিল। চীন ও জাপানের এই মন-কষাকষি দ্বিতীয় মহাসমর পর্যন্ত একটানা ভাবে চলতে থাকে।

ইতিমধ্যে জাপানে সমাজতান্ত্রিকতার প্রসারও কিছু কিছু ঘটতে থাকে। একবার প্রচলিত গবর্ণমেণ্টকে উল্টে দেবার চেষ্টাও হয়েছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে পুঁজিবাদীদের সাহায্যে চলছিল তারা ছিল এতই শক্তিশালী যে প্রগতিবাদী রাজনীতিকেরা বিশেষ কিছু করে উঠ্তে পারেন নি। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞান, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য

নানা দিকে জাপান যে সব উন্নতি করেছিল তা লক্ষ্য করবার বিষয়। জাপানের আসল উদ্দেশ্য ছিল এশিয়ার নেতা হয়ে এই বিরাট মহাদেশের অর্থনৈতিক আধিপত্য রক্ষা করা। এ বিষয়ে এসিয়ার বিভিন্ন দেশগুলিকে নানা প্রলোভন দেখাতেও সে ত্রুটি করে নি।

ভারতবর্ষ ছাড়া এ সময় আর একটি দেশ বিশেষ ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ দেশ তরুণ তুর্কী। যুদ্ধের পর তুর্কীদের অটোমান সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। পরাজিত জাতি বলে তাদের ঘাড়ে নানা বোঝা চাপান হয়। তুর্কীর সুলতান নামে রাজা হলেও তাঁর ক্ষমতা বিশেষ কিছুই ছিল না। তবে প্রজাদের উপর অত্যাচার করে কর আদায় করার সকল কার্যই সুসম্পন্ন হত। এই সময় একজন তরুণ সামরিক কর্মচারী মাথা তুলে দাঁড়ান। এঁর নাম কামাল পাশা। ইনি গ্রীকদের স্মার্ণা ও থ্রেস থেকে তাড়িয়ে দেন ; কনষ্টানটি-নোপল অধিকার করে ইস্তানবুল নাম দিয়ে তাকে তুর্কীর নতুন রাজধানীতে পরিণত করেন এবং সুলতানকে গদি থেকে সরিয়ে তুর্কীতে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজরা প্রথমে এঁর বিপক্ষে ছিলেন ; কিন্তু বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেন নি।

ক্ষমতা হাতে পেয়ে কামাল তুর্কীতে কতগুলি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনলেন। এর জন্য তাঁকে অদ্ভুত দৃঢ়তা এবং কৌশল দেখাতে হয়েছিল। শাসনতন্ত্রের মধ্যে যে সব

অপকর্ম চলছিল কামাল সম্পূর্ণভাবে সেগুলিকে দূর করে দেন। তুর্কীতে তিনি পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত এক ব্যবস্থাপক সভার প্রবর্তন করেন ; আইনের চোখে সকল তুর্কীর সমান অধিকার লাভ এ সময় থেকে আরম্ভ হয়। তাছাড়া তুর্কী পুরুষ ও মেয়েদের পূর্ব পোষাক পরিচ্ছদ তুলে দিয়ে ইনি পাশ্চাত্য ধরনের নতুন পোষাক পরিচ্ছদের প্রচলন করেন। শুধু তাই নয়, এতদিন তুর্কী ভাষা আরব্য লিপিতে লেখা হত ; এ সময় থেকে সে ভাষা রোমান হরফে লেখা আরম্ভ হল। ধর্মকে রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দিয়ে তুর্কীর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে তিনি সম্পূর্ণ নতুন এক অবস্থার সৃষ্টি করলেন।

১৯২১ সালে ইরান বা পারস্যের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং রেজা খানের অধীনে নানা বিষয়ে পারস্যের উন্নতিও এ যুগের এসিয়াতে লক্ষ্য করবার বিষয়।

মিশর ১৯২২ সালে কয়েকটি সর্তে ইংরেজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। তবে এই সর্তগুলি এতই নির্মম যে এগুলি মেনে নেবার পর মিশরকে যে স্বাধীনতা দেওয়া হল তা নামেই স্বাধীনতা, কাযে নয়। ফলে মিশরে অনবরত অসন্তোষ ও ব্রিটিশ বিদ্বেষ চলতে থাকে।

দ্বিতীয় মহাসমর

১৯১৪ সালের মহাসমরের তাল সামলাতে নানা দেশ যখন ব্যস্ত সেই সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে এক ভীষণ মন্দা দেখা দেয়। যুদ্ধের সময় অনেক দেশই বিশেষ করে জার্মানীতে, মুদ্রার অত্যধিক স্ফীতি ঘটেছিল। এর ফলে যুদ্ধের শেষের দিকে এবং অব্যবহিত পরে জিনিষপত্রের দাম খুব বেড়ে যায়। লোকের হাতে জিনিষপত্রের তুলনায় টাকাকড়ি জমে উঠেছিল বেশী। তাছাড়া যুদ্ধের পর দেখা গেল যে পৃথিবীর অধিকাংশ সোনা আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই তিনটি দেশে আটকে গেছে। এই সব দেশ হঠাৎ খুব ধনী হয়ে যাওয়াতে এখানকার নানা ব্যবসা দ্রুত ফেঁপে উঠতে লাগল। এদিকে পরাজিত জার্মানী পরাজয়ের ঋণ শোধ করে ফেলতে চাইল তার নিজের তৈরী জিনিসপত্র নানা দেশের বাজারে বিক্রী করে। সস্তায় মাল চালান দিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দখল করে ফেলবে এই মনোভাব নিয়ে জাপান, জার্মানী, আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতির মধ্যে এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হল। সারা পৃথিবীতে জিনিষ পত্রের দাম গেল অসম্ভব রকম কমে। ১৯২৮ সাল থেকে এর ফল জগতের প্রায় সব দেশ ভোগ করতে শুরু করেছিল। জিনিষপত্রের দাম অত্যন্ত কমে যাওয়ায় চাষীদের খুবই

অসুবিধে হতে লাগল। তাছাড়া যুদ্ধের পর থেকে পুঁজিবাদী ও শ্রমিকদের দ্বন্দ্ব তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছিল। কল-কারখানায় এবং খনিতে মজুরেরা ধর্মঘট আরম্ভ করে দিল। এতে অনেক দেশের গবর্ণমেণ্ট ও ব্যবসায়ীরা ভয় পেয়ে গেলেন। অনেকে ধরে নিলেন রুশিয়াতে নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার দরুণই পৃথিবীর মজুরেরা এই রকম করতে সাহস পাচ্ছে। কয়েকটি দেশ—বিশেষ করে ইংলণ্ড ও আমেরিকা—নানা প্রকার কম্যুনিষ্টবিরোধী প্রচেষ্টাকে উৎসাহদান আরম্ভ করলেন যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে সাম্যবাদী এবং পুঁজিবাদী ছুটি দলের মনোমালিন্য বাড়তে লাগল; সুতরাং এদিকে রুশিয়া এবং অন্যদিকে ইংলণ্ড ও আমেরিকা যে পরস্পরকে বরদস্ত করতে পারছিল না তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

ইতিমধ্যে জার্মানী ও ইটালীর যুদ্ধের আস্ফালন পৃথিবীর রাজনৈতিক অবস্থাকে আরও খারাপ করে দিল; এদিকে পূর্ব এসিয়ার প্রতি জাপানের লুব্ধ দৃষ্টি ক্রমেই ইংলণ্ড ও যুক্ত-রাজ্যের মনোভাবকে কঠিন করে আনছিল। মোটামুটি তিন দলে পৃথিবী ভাগ হয়ে গেল। একদলে হল ইটালী, জার্মানী ও জাপান; অন্য দলে রইল ইংলণ্ড ও আমেরিকা। রুশিয়া ছু দল থেকেই নিজের স্বাতন্ত্র্য ও দূরত্ব রক্ষা করে চলল। এ রকম অবস্থার মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অভাব স্বাভাবিক। তারই ফলে শক্তিশালী জাতিগুলির মধ্যে সামরিক সাজসজ্জার প্রতিযোগিতা চলতে লাগল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আসল কারণগুলি কী কী তা নির্ণয় করবার সময় এখনও আসেনি এবং এ কাহিনীতে সেগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করবার অবসরও আমাদের নেই। তবে প্যারিসের শান্তির বিষময় ফল, পুঁজিবাদী ও মজুরের ক্রমবর্দ্ধমান বিভেদ এবং সাম্রাজ্য প্রসারের তীব্র আকাঙ্ক্ষা এই মহাযুদ্ধকে অনেকটা এগিয়ে এনেছিল বললে বোধহয় খুব অন্যায় বলা হবে না।

জার্মানীর উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং চীনের উপর জাপানের অত্যাচারকে ইংলণ্ড কিছুদিন পর্যন্ত, যে কারণেই হোক, এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেছিল। যুক্তরাজ্যও দূরে দাঁড়িয়ে কিছুদিন অবধি নিরপেক্ষ দর্শকের স্থান অধিকার করেছিল। কিছু জার্মানী যখন একটির পর একটি ইওরোপের অধিকাংশ দেশ গ্রাস করে ফ্রান্সের দিকে হানা দিতে চাইল তখন ইংলণ্ড আর চুপ করে থাকতে পারল না। ১৯১৪ সালের মত দু' দেশে আবার শক্তিপরীক্ষা আরম্ভ হল।

যুদ্ধের প্রথমে জার্মানীর ক্ষিপ্রগতি দেখে মনে হল যে সম্মিলিত জাতিগুলির এবার বুঝি আর রক্ষে নেই। ইটালীর সঙ্গে মিতালি করে জার্মানী ফ্রান্স পর্যন্ত অনায়াসে চলে এল এবং ইংলণ্ডের উপর আরম্ভ করল প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ। শুধু তাই নয়, উত্তর আফ্রিকা পার হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে আসা তার খুব অসুবিধে হল না। এক সময় সত্যিই মনে হয়েছিল যে ইরাণ পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত ভূখণ্ডে জার্মান আধিপত্যের

দিন বুঝি খুব দূরে নেই। কিন্তু জার্মানী চালে ভুল করল রুশিয়া আক্রমণ করে। রুশিয়ার শক্তি কী রকম বেড়েছে এবং তার যুঝবার ক্ষমতা কতটা জার্মানী তা' ভাল বুঝতে না পেরেই সে দেশকে আক্রমণ করে বসল। ক্রমেই একথা কিন্তু সে মর্মে মর্মে অনুভব করল যে সে সাপের গর্তে পা দিয়েছে। তবে রুশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর যে বিরোধ তা শুধু দেশ জয়ের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিরোধ নয়, তা মতবাদের বিরোধ। হিটল্লার একাধিকবার এ কথা তাঁর দেশবাসীদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে ইংলণ্ড জার্মানীর প্রকৃত শত্রু নয়; প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের সঙ্গে সে যুদ্ধ চায়ই নি। জার্মনীর আসল শত্রু হচ্ছে কম্যুনিষ্ট রুশিয়া। ইতিমধ্যে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুক্তরাজ্য যুদ্ধে নেমে পড়ায় যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। যুক্তরাজ্য তার প্রচুর লোকবল ও অর্থবল নিয়ে জার্মানীকে অনবরত আঘাত করতে লাগল, কিন্তু জার্মানী ফিরে ঘা দিতে পারল না। ইংলণ্ড, রুশিয়া ও যুক্তরাজ্যের মিলিত আক্রমণে জার্মানীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের প্রচেষ্টা আরও আকস্মিক। পার্ল হারবার আক্রমণের দ্বারা যুক্তরাজ্যকে সাময়িকভাবে কাবু করে পূর্ব প্রাচ্যে অবস্থিত দু'খানি শ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ রণতরী প্রিন্স অব্ ওয়েলস ও রিপালস্ ধ্বংস করে দিয়ে সে যখন সিঙ্গাপুর ও বর্মার উপর আক্রমণ চালাল তখন মনে হল জাপান বুঝি এমন কিছু করে বসবে ইতিহাসে যার তুলনা

নেই। এখানেও যুক্তরাজ্যের আঘাতই জাপানকে পঙ্গু করে ফেলল। আমেরিকার অগাধ ধনদৌলত, বিপুল লোকবল এবং তার ভৌগলিক অবস্থিতি তাকে যে সুবিধে দিল সে সুবিধে অন্য কোন দেশই পায় নি। ক্ষুদ্র জাপান এই বিরাট শক্তিশালী দেশের বিরুদ্ধে কতক্ষণ দাঁড়াতে পারে! শেষ পর্যন্ত আনবিক বোমার মারাত্মক আঘাতে পূর্ব এসিয়ার উদীয়মান সূর্য তেজোহীন ও অন্ধকার হয়ে গেল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবী।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর ইতিহাস লিখতে যাওয়া বিপজ্জনক। ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিরপেক্ষভাবে সমসাময়িক ঘটনার সুষ্ঠু বিচার অতি কঠিন কায। যে পরিস্থিতির ভিতর ঐতিহাসিক বাস করছেন, যার ঢেউ তাঁর মনের তটভূমিকে প্লাবিত করতে চেষ্টা করছে দুর্বল মুহূর্তে বা ভাবপ্রবণতার আতিশয্যে ঐতিহাসিক যদি সাধারণ মানুষের চোখে অথবা কোন মতবাদের মাপকাঠিতে তার বিচার করতে প্রয়াস করেন তাহলে সত্যের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা হবে। তবু সমসাময়িক ঘটনাবলীর পর্যালোচনা না করলে আমাদের এ কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অতএব আমরা বর্তমান জগতের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির সংক্ষেপ আলোচনা করব মাত্র।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যে সকল পরিবর্তন এনেছে তার মধ্যে তিনটি বিশেষ করে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

প্রথমটি বিমান চলাচলের দ্রুত উন্নতি ও প্রসার। এর ফলে প্রত্যেক দেশের সঙ্গে প্রত্যেক দেশের যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে এবং ভবিষ্যৎ-যুদ্ধের ধ্বংস-ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্রমেই প্রকট হয়ে উঠছে। বিমানের উন্নতির ফলে একদিক থেকে শান্তির প্রচেষ্টা, দুর্গতদের সেবা এবং বিভিন্ন

দেশের সহযোগ যেমন মানুষকে আশা দিচ্ছে অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী ধ্বংসলীলার আশঙ্কা তেমনি তাকে আশাহত করছে।

দ্বিতীয়তঃ, গত যুদ্ধে মিত্রশক্তির যারা প্রধান নায়ক ছিলেন কার্যোপলক্ষে তাঁরা পরস্পর অনেকটা সহযোগিতা করলেও তাঁদের মধ্যে সত্যিকারের মিল ছিল না এবং পরস্পরের প্রতি ছিল বিশ্বাসের একান্ত অভাব। তার ফলে যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী দুটি দলে ভাগ হয়ে গেছে। একটি দলের আধিপত্য করছেন আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও ইংলণ্ড, আর একটির নায়ক হচ্ছেন রুশিয়া। ইঙ্গ-আমেরিকান দল বিশ্বাস করেন যে রুশিয়ায় এক বিকট ফ্যাশিবাদের রাজত্ব চলেছে; সেখানে স্বাধীন মতামত ও ব্যক্তিত্বের টুঁটি টিপে ধরা হয়েছে। ধর্ম, বিজ্ঞান, শিক্ষা সবই এক বিশেষ মতবাদের ছাঁচে ঢালাই করে মানুষকে মনুষ্যত্বহীন করবার চেষ্টা চলেছে, গণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ছলে, বলে ও কৌশলে রুশ সাম্রাজ্যবাদ প্রচারের চেষ্টা চলেছে; সোভিয়েট প্রভাবান্বিত দেশগুলি, এঁদের মতে, বাইরে থেকে স্বাধীন বলে প্রচারিত হলেও আসলে রুশিয়ার তাঁবেদার। এদের রাজনীতি, শিক্ষানীতি, অর্থনীতি সবই প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে রুশিয়ার অনুমোদিত। এই সব দেশ সকল কাযে প্রেরণা পান রুশিয়ার কাছে এবং কথায় কথায় রুশিয়ার পরামর্শ নিতে ছোটেন।

অপর পক্ষে সোভিয়েট দল মনে করেন ইঙ্গমার্কিন দল পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের কুশ্রী প্রতীক মাত্র। এদের তথাকথিত ডিমোক্রেসী হচ্ছে ধোঁকাবাজি; গণতন্ত্রের প্যাকেটে মোড়া ধনতন্ত্রই হচ্ছে এদের আসল অস্ত্র। সেই অস্ত্র দিয়ে এরা নাকি গরীব আর মজুরদের চিরকাল দাবিয়ে রাখতে চায়, আর তাদের বুকের উপর বসে সমাজের সত্যিকারের অগ্রগতি ব্যাহত করে রাখে। এ দল বলেন যে পিছিয়ে পড়া দেশগুলোর উপর অত্যাচার করে ইঙ্গ-মার্কিন দল নিজেদের থলি ভর্তি করছে এবং নগ্ন-সাম্রাজ্য-বাদের সাহায্যে অনুন্নত দেশগুলিকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে চলেছে। অতএব দুটি দল পরস্পরের প্রতি গভীর ঘৃণা ও শত্রুভাব পোষণ করবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এই মনোভাব ক্রমাগতই আর একটি বিশ্বযুদ্ধকে এগিয়ে আনবার চেষ্টা করছে। কোরিয়া বা ইন্দোচীনের রণাঙ্গনে যে ইতিমধ্যে এক বিশ্বযুদ্ধের অবতারণা হয় নি তাতেই আশ্চর্য মনে হয়।

এই অন্ধকারের মধ্যে আলোর রেশ পাচ্ছি সম্মিলিত জাতি-সঙ্ঘের শান্তি প্রচেষ্টায়। একথা ঠিক যে এখানেও উগ্র দলাদলি, আইনের মারপ্যাঁচ এবং সদিচ্ছার অভাব সফলতার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে রয়েছে। তবু এ কথা না বললে সত্যকে অস্বীকার করা হবে যে যুদ্ধোত্তর মানবের এই উদ্যমের মধ্যে মহৎ প্রেরণা রয়েছে অনেকখানি। লিগ

অব নেশনসের তুলনায় বর্তমান জাতিসঙ্ঘ অনেকটা গণ-তান্ত্রিক। পৃথিবীর সকল দেশ এই সঙ্ঘের সভ্যরূপে কায করছেন এবং এই সঙ্ঘের প্রভাবে বহু অবাঞ্ছিত প্রচেষ্টাকে নিস্ফল করা হয়েছে। সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ইত্যাদির দিক থেকে এই সঙ্ঘ যে সকল কায আরম্ভ করেছেন সেগুলির প্রশংসা না করলে বর্তমান পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক কথা না বলা থেকে যাবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জাপানের কবল থেকে সদ্যমুক্ত কোরিয়াকে নিয়ে জগতে এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে; ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র কী ভাবে গঠিত হওয়া উচিত তাই নিয়ে তীব্র মতভেদ হওয়াতে এদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বেধে যায়। কম্যুনিষ্ট চীনের মধ্য দিয়ে উত্তরাংশে রুশ-প্রভাব পৌঁছাতে থাকে, আর দক্ষিণাংশ জাপানে অবস্থিত মার্কিন শক্তির সংস্পর্শে এসে আমেরিকার ভাবধারায় অনু-প্রাণিত হয়ে ওঠে। এই গৃহযুদ্ধ কিছুদিন চলবার পর মার্কিন দেশ বলেন যে আসলে কোরিয়ার দুটি অংশের মধ্যে যুদ্ধ হচ্ছে না, ভিতরে ভিতরে সোভিয়েট রুশিয়া অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য করে উত্তর কোরিয়াকে জিতিয়ে দিচ্ছে এবং ক্রমে সমস্ত কোরিয়াকে কম্যুনিষ্ট-ভাবাপন্ন করবার চেষ্টায় আছে। যুক্তরাজ্য রুশিয়ার এ প্রয়াসকে স্বাধীন গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলসূচক বলে মনে করেন এবং দক্ষিণ কোরিয়াকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করেই ক্ষান্ত হন নি, সরাসরি যুদ্ধে নেমে

কোরিয়ায় কম্যুনিষ্ট প্রসারকে বন্ধ করে দিতে চেষ্টা করেন। যুক্তরাজ্যের এই কার্যের ফলে রুশিয়া ও চীন প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে না নামলেও পরোক্ষভাবে উত্তর কোরিয়াকে নানা সাহায্য করতে থাকেন এবং পুনরায় পৃথিবীতে আর এক মহাযুদ্ধ এল বলে ভয় দেখাতে আরম্ভ করেন। দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি সিংগম্যান রী তাঁর গর্জন ও আস্ফালনে সমস্ত ঘটনাটিকে আরও গোলমেলে করে ফেলেন। এইভাবে যখন আর একটি মহাযুদ্ধ আসন্ন বলে মনে হচ্ছিল তখন সম্মিলিত-জাতি-সঙ্ঘের প্রচেষ্টার ফলে এবং কয়েকটি রাষ্ট্রের বিশেষ আগ্রহে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে একটা আপোষের চেষ্টা হয়। তার ফলে দুপক্ষের মধ্যে মিটমাট না হলেও সাময়িক ভাবে যুদ্ধ বন্ধ আছে এবং নানা প্রকারে মীমাংসার চেষ্টা চলছে।

কোরিয়ার প্রতিবেশী যুদ্ধে বিপর্যস্ত নিপ্পন পুনর্গঠনের কাজে ব্যস্ত। হিরোসিমার ক্ষত শুকোতে অনেক দেরী হবে। জাপানের ব্যবসা যুদ্ধের ফলে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; কিন্তু অসামান্য উদ্যম ও অধ্যবসায় নিয়ে জাপানীরা নিঃশব্দে এগিয়ে চলবার চেষ্টা করছে। জাপানের যুদ্ধোত্তর গঠন কার্য উচ্চতম প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু বিজেতা মার্কিন শক্তির নাগপাশ জাপানের দেহ থেকে সম্পূর্ণ খুলে না আসা পর্যন্ত জাপান আবার তার পূর্বশক্তি ফিরে পাবে কী?

ডাচ সাম্রাজ্যবাদকে চূর্ণ করে তার উপর নবীন

ইন্দোনেশিয়ার পুনরুত্থান বর্তমান এসিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মালয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জনসাধারণের সংগ্রাম চলেছে। স্বাধীনতার দাবী নিয়ে এ সংগ্রামের সুরু। ইংরেজরা বল্‌ছেন এ সংগ্রামের মূলে রয়েছে কম্যুনিষ্ট প্ররোচনা। এ যুক্তির মধ্যে হয় তো কিছুটা সত্য আছে; তবে স্বাধীনতার দাবীকে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

চৈনিক গণতন্ত্রের জন্ম এ সময়ের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গত ত্রিশ বৎসর ছিল চীনের অতি দুঃসময়। এক দিকে মাঞ্চুরিয়াতে জাপানের বর্বর আক্রমণ ও আর্থিক শোষণ অন্য দিকে গৃহযুদ্ধ এই দুটি ক্রমেই চীনকে কাবু করে ফেলছিল। কুয়োমিনটাং যুক্তরাজ্যের নিকট থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েও তার সদ্ব্যবহার করতে পারে নি। চিয়াং কাই শেকের দল নানাভাবে দুর্নীতি ও অযোগ্যতার পরিচয় দিয়ে আসছিল। ধীরে ধীরে কম্যুনিষ্ট চীন শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং চিয়াংএর হাত থেকে শাসনতন্ত্র ছিনিয়ে নিল। চিয়াং তাঁর দলবল নিয়ে ছোট্ট তাইওয়ান দ্বীপে বসে আস্ফালন করতে লাগলেন। শোনা যায় নতুন চীনে নানা বিষয়ে অনেক উন্নতি হচ্ছে। তবে এদেশের উপর বর্তমানে মস্কোর প্রভাব কতখানি তা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। এক মার্কিন যুক্তরাজ্য ছাড়া প্রায় সকল দেশই মাও সে তুংএর

মাও-সে-তুং

চীনকে স্বীকার করে নিয়েছেন। চীনের এ অভ্যুত্থান পৃথিবীর পক্ষে শুভ বা অশুভ একমাত্র ভবিষ্যতের ইতিহাসই সে বিষয়ে সাক্ষ্য দেবে। চীনের পাশে ইন্দোচীনও আর ফরাসীদের অধীনে থাকতে রাজী নয়। সেখানেও হো চি মিন্‌এর সৈন্যেরা বিদেশীদের হটিয়ে দিয়েছে। স্বাধীন ব্রহ্মদেশ ও সিংহল নানা সমস্যার সম্মুখীন। পাকীস্তানে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছে। দলীয় স্বার্থ ও দুর্নীতি এদেশের উন্নতিতে আটকে রেখেছে বলে বোধ হয়। এ অবস্থায় আমেরিকার আর্থিক ও সামরিক সাহায্য এদেশকে কতটুকু এগিতে দিতে পারবে তা ভাববার বিষয়।

স্বাধীন ভারতের রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি লক্ষ্য করবার বিষয়। ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে ঘোষিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, তথাকথিত নীচজাতিগুলির উপর অত্যাচার নিবারণের জন্য ভারত সরকার সর্বপ্রকারে তৎপর হয়েছেন। ভারতের সম্মুখে বর্তমানে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতিবিধান এবং জনসাধারনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। পঞ্চবার্ষীকী পরিকল্পনাগুলির সাহায্যে এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা চলছে। ভারতের পররাষ্ট্র-নীতিও অনুধাবনযোগ্য। এদেশের বিশ্বাস যে সোভিয়েট ও ইঙ্গ-মার্কিন দল দুটি পৃথিবীকে আর এক যুদ্ধের দিকে টেনে যাচ্ছে। তাই ভারত মনে করে যে কোন দলে যোগ না দিয়ে নিরপেক্ষ থেকে উভয় দলের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করাই

উচিত এবং সময় বিশেষে যে দলের কার্য অধিকতর যুক্তিপূর্ণ প্রতীয়মান হবে তাকে সকল প্রকারে- নৈতিক সমর্থন দান করা কর্তব্য। অনেকে মনে করেন যে এ নীতি কার্যতঃ বেশীদূর এগুতে পারে না। দুটি দলের একটিতে যোগ না দিলে এই দুর্বল রাষ্ট্রের কথার কোন দামই কেউ দেবে না এবং শেষ পর্যন্ত তার স্বাধীনতা রক্ষাও কঠিন হতে পারে। কিন্তু এ নীতি অবলম্বনের পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের প্রতি-পত্তি বেড়েছে বই কমে নি। আর বর্তমান পৃথিবীতে যে সংশয় ও বিদ্বেষভাব ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে আসছে তা দূর করতে হলে ভারতের দর্শিত পথ সত্যই সাহায্য করতে পারে কি না তাহা পরীক্ষা করে দেখবার সময় এসেছে।

জহরলাল নেহরু

দার্জিলিংবাসী শেরপা তেনজিং এবং নিউজিল্যাণ্ডের এডমণ্ড হিলারী কর্তৃক এভারেষ্ট বিজয় যুদ্ধোত্তর জগতের এক স্মরণীয় ঘটনা। প্রকৃতির উপর মানবের এই আধিপত্য তাকে নতুন প্রেরণা দিয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইরাণের অনেক পরিবর্তন হল। রেজা শাকে সরিয়ে দেবার পর ব্রিটিশ শক্তি ইরাণে বিশেষ অপ্রিয় হয়ে পড়ে। এংলো পারসিয়েন অয়েল কোম্পানীর

দৌলতে ইংরেজরা যে মোটা মুনাফা উপভোগ করছিল দেশের জনসাধারণ তাতে অতি অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। ডাঃ মোসাদেক প্রধান মন্ত্রী হ'বার পর ইংলণ্ডের সঙ্গে ইরানের তৈলচুক্তি ভেঙে দেওয়া হল এবং তেলের ব্যবসাকে সরকার নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। মোসাদেকের সব কায আইন-সিদ্ধ না হতে পারে তবে তাঁর অধিকাংশ কাযের পেছনে জনগণের যে সমর্থন ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিছুদিন পর আর একটি রাজনৈতিক দল হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে শাসনতন্ত্র অধিকার করে নেন। বিচারে বৃদ্ধ মোসাদেকের জেল হয়ে যায়। এই নতুন দল মনে করেন যে মোসাদেকের কাযের পেছনে কম্যুনিষ্ট প্ররোচনা ছিল এবং তিনি বাড়াবাড়ি করে ইরানে অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন। তবে অনেকে আবার এ কথাও বলছেন যে নতুন রাজনৈতিক দলের উত্থানের পশ্চাতে ইংলণ্ড ও আমেরিকার কারসাজি রয়েছে। নতুন সরকার কী ভাবে ইরাণের উন্নতি করেন জগৎ তা সাগ্রহে লক্ষ্য করবে।

এসিয়ার একেবারে পশ্চিমে আরব ও ইসরায়েলের অনাদিকালের রেষারেষি আজও চলেছে। তবে মরুভূমির বুকের উপর নতুন ইসরায়েলের অদ্ভুত উন্নতিকে তারিফ না করে থাকা যায় না।

মধ্যপ্রাচ্যের আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় মিশরের রাজনীতি। একদিকে ক্রমবর্ধমান ইংরেজ বিদ্বেষ, অন্যদিকে

রাজা ফারুকের কুশাসন—এই দুইএর মধ্যে পড়ে মিশরবাসী ক্রমেই উত্যক্ত হয়ে উঠছিল। সুয়েজ ক্যানালে ব্রিটিশ মোড়লি সহ্য করা মিশরের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠছিল। দেশের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ করে বসল এবং জেনারেল নেগিব মিশরের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হলেন। ফারুককে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করা হল, মিশর জগৎবাসীকে শোনাল যে নানাদিক থেকে আভ্যন্তরিক উন্নতির চেষ্টা হচ্ছে। অবস্থা যখন এই তখন সৈন্যবাহিনীর একটি শাখা রাতারাতি বিদ্রোহ করে ক্ষমতা দখল করল। এরা কিন্তু নেগিবকে সরিয়ে দেয় নি, বরঞ্চ রাষ্ট্রপতির পদ দিয়েছে ; তবে সত্যিকারের ক্ষমতা চলে গেছে নেসার নামে একজন যুবক সেনাধ্যক্ষের হাতে। মিশরের ভিতরকার এই ওলটপালট বাইরে থেকে বুঝে ওঠা কঠিন। ইতিমধ্যে সুয়েজ এলাকা থেকে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণের ফলে ইংলণ্ড ও মিশরের মধ্যে শান্তির চেষ্টা অনেকটা ফলবতী হয়েছে।

পূর্ব আফ্রিকায় স্বাধীনতার দাবী মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কেনিয়াতে নিগ্রোরা মরিয়া হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কার্য আরম্ভ করেছে। মাউ মাউ বা সন্ত্রাসবাদী দল ইংরেজদের হাত থেকে শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারবে কি না তা নিয়ে অনেকে মাথা ঘামাচ্ছেন। ইংরেজরা এই অন্ধকারের দেশে এতদিন যে শোষণ নীতি চালিয়েছিল তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম যে এই হবে তা বুঝতে কারুর বাকী নেই।

কিন্তু সভ্যজগতে দক্ষিণ আফ্রিকার নীতি যে একেবারেই অসম্ভব এ বিষয়ে কালো ধলো কোন দেশেরই সন্দেহ নেই। কালা আদমীদের সকল ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করে তাদের দাসত্বের পর্যায়ে ফেলে রেখে নানা অশোভনীয়, অন্যায় ও বেআইনী উপায়ে শ্বেতকায় অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষণ এ নীতির মূলকথা। কোন সভ্য দেশই এরূপ নীতির পক্ষপাতী হতে পারে না। অনেক শ্বেতকায় ব্যক্তি এ মত ব্যক্ত করেছেন যে দক্ষিণ আফ্রিকা যে শুধু নিজের সর্বনাশ করছে তাই নয় শ্বেতকায় জাতিগুলির উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জেনে রাখা ভাল যে সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ আফ্রিকার এই নীতির নিন্দে করেছেন।

পূর্ব ইওরোপের অবস্থা সম্বন্ধে বাইরে থেকে বড় কিছু জানা যায় না। যুদ্ধের পর ইওরোপের এই অংশ, বিশেষ করে চেকোশ্লোভাকিয়া, কম্যুনিষ্ট প্রভাবে এসেছে। একমাত্র যুগোশ্লোভিয়া মার্শ্যাল টিটোর অধীনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ইওরোপের এ অঞ্চলের উপর রুশিয়ার জোর কতখানি তা নিশ্চয় করে বলা শক্ত ; তবে এ কথা বুঝতে দেরী হয় না যে এদের স্বাধীনতা পূর্বের মত আর নেই। যুদ্ধের পর রুশিয়ার প্রভাব যে ভাবে পূর্ব ইওরোপ ও পূর্ব জার্মানীতে দেখা দিয়েছে তাতে পশ্চিমের দেশগুলি চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা মনে করেন যে কম্যুনিষ্ট পশুশক্তির নিকট ডিমোক্রেসীর এই নতি স্বীকার মানব সভ্যতার দুর্দিনের সূচনা করেছে।

ইওরোপের সকল দেশগুলির মধ্যে জার্মানীর অবস্থা সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক। যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি, আর্থিক ও রাজনৈতিক দুর্দশা জার্মানদের তত কাবু করতে পারে নি যত কাবু করেছে জার্মানীর খণ্ডিত অবস্থা। যুদ্ধ জয়ের পর দ্বিখণ্ডিত জার্মানীকে নিয়েই রুশিয়ার সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন দলের প্রকাশ্য মতভেদ আরম্ভ হয়। এই দুর্ভাগ্য দেশের এক অংশের উপর চেপে বসে ইংলণ্ড আর আমেরিকা করছেন ডিমোক্রেসীর গুণকীর্তন; অন্য অংশের উপর দাঁড়িয়ে সোভিয়েট রুশিয়া করছেন কম্যুনিজমের মাহাত্ম্য বর্ণন। মাঝে পড়ে জার্মানদের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিক থেকেও জার্মানীর এ অবস্থা অতিশয় অমঙ্গলসূচক। পরাজিত দ্বিধাবিভক্ত জার্মানী বারুদের স্তূপ। দুদলের যে কোন একদল তুচ্ছ ঘটনা অবলম্বন করে একটি দেশলাইএর কাঠি জালিয়ে এ স্তূপের উপর নিক্ষেপ করলে তৎক্ষণাৎ বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠবে। জার্মানীর পাশে ক্ষয়িষ্ণু ফ্রান্স। দুটি যুদ্ধের খণ্ড প্রলয় এ দেশের উপর দিয়ে চলে গেছে। যুদ্ধের পর এদেশে কম্যুনিজম মাথা চাড়া দেবার চেষ্টা করছে। ক্রমাগত জনসংখ্যা-হ্রাস এদেশের আর একটি সমস্যা। এই সব জটিলতার মধ্যে ইন্দোচীনের যুদ্ধ ফ্রান্সকে বেশ কাবু করেছে বলে মনে হয়।

ইংরেজ যুদ্ধোত্তর অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খানিকটা খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করছে। স্বাধীনতার বিষয়ে ভারত,

ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের সঙ্গে ইংলণ্ডের আপোষ এ যুগের একটা বিস্ময়কর ঘটনা। শ্রমিকদল ক্ষমতা হাতে পেয়ে দেশের আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থাগুলির যে ভাবে সংস্কার করছিলেন তা জগতের লোক সাগ্রহে দেখছিল। যুদ্ধে জয়ী হলেও ইংলণ্ডের সমস্যা অনেক। তাছাড়া প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ এদেশের উপর একটা স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। একথা মানতে হবে যে বর্তমান জগতে ইংরেজদের মত রাজনীতিতে বিচক্ষণ জাত আর কেউ নেই। তবে একথাও মনে রাখা দরকার যে ইংরেজ তার সাম্রাজ্য-প্রীতি এখনও সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারে নি। মালয় এবং পূর্ব আফ্রিকাতে যা ঘটছে তার জন্য ইংরেজের বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। আর একটা কথাও মনে রাখা দরকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে নেতৃত্ব করবার দিন ইংরেজদের ফুরিয়ে গেছে। নেতার আসনে আজ বসেছেন একদিকে মার্কিনদেশ অন্যদিকে রুশিয়া। তবে সর্বক্ষেত্রে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে ইংলণ্ডের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা মার্কিন নীতির তীব্রতাকে অনেকখানি হ্রাস করবে বলে মনে হয়।

চার্চিল

কম্যুনিষ্ট রুশিয়া গরীবের জন্য যা করেছে কৃতজ্ঞচিত্তে মানুষ তা স্মরণ করবে। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য গত মহাযুদ্ধে জার্মানীর সঙ্গে রুশিয়ার অদ্ভুত সংগ্রাম এক স্মরণীয় ঘটনা। কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতার লোপ সাধন করে যদি এ দেশের

উন্নতি ঘটে থাকে তাহলে এ প্রশংসা সত্যিই তার প্রাপ্য কি না সে বিষয়ে আলোচনা প্রয়োজন। লৌহ যবনিকা কথাটা কতটা সত্যি ও কতটা কল্পনা তা আমরা জানি না। তবে এ কথা ঠিক যে রুশিয়ার শিক্ষা-দীক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থার ভিতর এমন একটা ভাব রয়েছে যা খুব স্বাভাবিক নয়। মতবাদের ছাঁচে ঢালাই এ সমাজব্যবস্থা ধোপে কতখানি টিকবে তার বিচার করবে ইতিহাস; তবে লেনিন ও ষ্ট্যালিনের হাতে যে অপরিসীম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল গণতন্ত্রের আবহাওয়ায় মানুষ কেউ তা অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করতে পারে না। কম্যুনিজমকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য দেশের মধ্যে এবং বাহিরে ব্যাপক গুপ্তচরবৃত্তি, স্বাধীন মতামতকে চেপে রাখবার জন্য তথাকথিত বিচারের প্রহসন, পিছিয়ে পড়া দেশ-গুলোর দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাদের উপর নানা কৌশলে নিজের প্রভাব ও মতবাদ প্রয়োগ প্রভৃতিকে সন্দেহের চোখে না দেখে পারা যায় না; তবে রুশিয়ার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য জগতে যে অপপ্রচার চলেছে তাকেও উপেক্ষা করা চলেনা।

ষ্ট্যালিন

রুশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবলপ্রতাপ মার্কিন রাজ্যের পররাষ্ট্র নীতি সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই দুএক কথা বলা হয়েছে। নবীন গণতন্ত্রের জন্মদাতা সর্বক্ষেত্রে উন্নতিশীল এই বিরাট দেশটি

স্বভাবতই শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। দেশের মধ্যে নিগ্রোসমস্যা থাকলেও ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশ সাধনের জন্য যুক্তরাজ্যের প্রচেষ্টা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য। বিগত শতাব্দীতে দাস প্রথার বিলোপ সাধন করে এবং বহুবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা মানবের উন্নতি সাধনের জন্য সকল সভ্যদেশ যুক্তরাজ্যের নিকট কৃতজ্ঞ থাকবে। পিছিয়ে পড়া দেশগুলিকে নানাবিধ

আইসেনহাওয়ার

সাহায্য দান বর্তমানে এ দেশের একটি মহৎ কাজ। তবু একথা বলতে হবে যে যুক্তরাজ্যের কম্যুনিষ্ট বিদ্বেষ প্রায় চরম অবস্থায় পৌঁছেচে। সব কিছুতে কম্যুনিষ্ট জুজু দেখা এ দেশের একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধুয়া তুলে যুক্তরাজ্যকে অনেকক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত স্থানে অকৃপণ হস্তে সাহায্য দান করতে দেখা যাচ্ছে। বস্তুতঃ ম্যাকার্থীর চোখে জগৎকে দেখা একটা মস্ত বড় দুর্ভাগ্য; যুক্তরাজ্যের জনসাধারণ যত শীঘ্র এ কথাটা বুঝতে পারে ততই মঙ্গল। বলদর্পী মার্কিন রাজ্য আরও একটা ভুল করছে বলে মনে হয়। ভয় দেখিয়ে পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা নিষ্ফল। আজ হাইড্রোজেন বোমার ভয় দেখিয়ে রুশিয়াকে থামিয়ে দিলেও কাল রুশিয়া নতুন অস্ত্র বের করবে। অস্ত্র সজ্জার এই মারাত্মক প্রতিযোগিতা যুদ্ধকে থামিয়ে রাখে না বরঞ্চ এগিয়ে আনে—অতীতের ইতিহাস বার বার এ কথাই

আমাদের বলেছে। এক কথায়, যুক্তরাজ্য বা রুশিয়া কেউই পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুভাবের প্রতিকারে তৎপর নয়; একে অন্যকে দোষারোপ করছে মাত্র।

এ অবস্থায় ভবিষ্যদ্বানী করতে যাওয়া মূর্খতা। জগতের সকল জাতি যতদিন একজোটে না বুঝবে যে একজনকে মেরে আর একজন বড় হতে পারবে না ততদিন যুদ্ধ চলবেই। কিন্তু পৃথিবীর সকল জাতিগুলির এই মনোভাব কোন দিন এক সঙ্গে হবে কী? অনেকে বলেন অতদূর অগ্রসর হবার আগেই মানুষ পৃথিবীর বুক থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষ চিরকালই ক্রমোন্নতিতে আস্থাবান; তাই আমরা আশা করব যে অতীতের লাভ ও ক্ষতির ইতিহাস ভবিষ্যতে তাকে এক নতুন জগৎ রচনা করবার প্রেরণা দেবে।